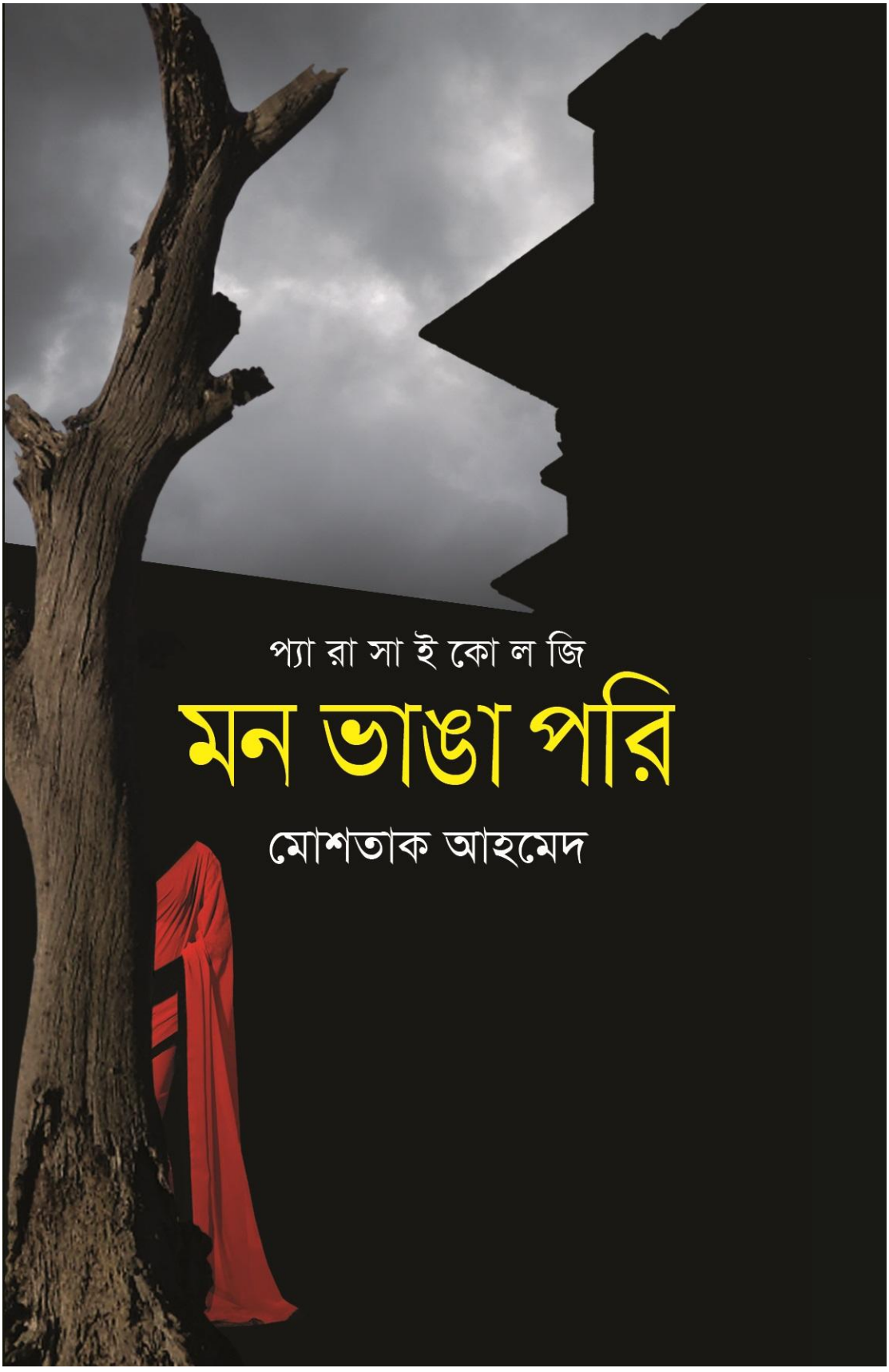

প্যা রা সা ই কো ল জি

মন ভাঙা পরি

মোশতাক আহমেদ

মন ভাঙ্গা পরী

মোশতাক আহমেদ

ইমরান অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে পরীর দিকে। ধীরে ধীরে অপূর্ব সুন্দর পরীর চেহারাটা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। কাঁপতে শুরু করেছে সমস্ত শরীর। চোখের মনি দুটোও আর আগের মতো নেই, বড় হয়ে চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করেছে চোখের ভিতর। তারপর হঠাৎই হাত-পাগুলো নিজে থেকেই বেঁকে যেতে শুরু করল। সেই সাথে মুখ দিয়ে গো গো অদ্ভুত একটা শব্দ বের হতে লাগল। মনে হলো পরী যেন কিছু বলতে চাচ্ছে, কিন্তু বলতে পারছে না। ইমরান বুঝতে পারল ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে পরীর, কিন্তু কী করবে সে? এক সময় সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল পরী। ইমরান আপ্রাণ চেষ্টা করল পরীকে নিবৃত্ত করতে। কিন্তু পারল না। পরীর শরীরে যেন অসুরের শক্তি। ভয় পেয়ে ইমরান বাড়ির সবার সাহায্য কামনা করল। সবাই পরীকে দেখে বুঝল পরীকে ভয়ংকর জ্বীনে ধরেছে। তাকে বাঁচাতে হলে জ্বীন ছাড়াতে হবে। ডাকা হলো জব্বার ফকিরকে। পরীর উপর জব্বার ফকিরের অমানুষিক অত্যাচার কিছুতেই মেনে নিতে পারল না ইমরান। পরীকে বাঁচাতে সে পরীকে নিয়ে ঢাকায় চলে এলো। কিন্তু ঢাকার জীবন যে তার জন্য আরও কষ্টের, আরও অনিশ্চয়তার। কে সাহায্য করবে তাকে? এখানে যে তাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। বরং পদে পদে বিপদ আর বাঁধা। এদিকে ইমরান জানতে পারল পরী তাকেই হত্যা করতে পারে। কী ভয়ংকর কথা! যাকে সে বাঁচানোর চেষ্টা করছে সেই কিনা তাকে হত্যা করবে! শেষ পর্যন্ত সে শরানপন্ন হলো ডাক্তার তরফদারের।

ডাক্তার তরফদার কী শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পেরেছিল ইমরানকে? আর কী ঘটেছিল পরীর ভাগ্যে?

মন ভাঙ্গা পরী

মোশতাক আহমেদ
(Mostaque Ahamed)

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশঃ একুশে বইমেলা ২০১৪

১

আজ ইমরান আর পরীর বাসর রাত।

ইমরান ঘড়ি দেখল, সময় রাত এগারোটা। গ্রাম এলাকার জন্য সময়টা অনেক রাতই বলা যায়। সাধারণত এত রাত পর্যন্ত গ্রামের মানুষেরা জেগে থাকে না। অথচ তাদের বাড়ির লোকজন জেগে আছে। জেগে থাকার অবশ্য কারণ আছে। সকাল থেকে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলোর কোনোকিছুই কাঙ্খিত ছিল না। এজন্য দিনশেষে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা, জল্পনা-কল্পনাও হচ্ছে বেশি। হবেও বা না কেন? আজকের ঘটনাগুলোর কোনোকিছুরই যে প্রস্তুতি ছিল না।

বিকম পাশ করে ইমরান নয় মাস হলো ঢাকায় একটা প্রাইভেট ব্যাংকে যোগ দিয়েছে। পদ ক্যাশিয়ার। বেতন খুব বেশি না হলেও মোটামুটি চলে যায়। চাকরি পাওয়ার পর সে সাতদিনের ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। এর মধ্যে তিন দিন পার হয়েছে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতেই তার বাবা প্রাথমিক স্কুলের মাস্টার রতন কাজী জানায় বিয়ের জন্য তাকে এক মেয়েকে দেখতে যেতে হবে।

ইমরান অবাক হয়ে বলে, কি বলছ বাবা? এখন বিয়ে করব কেন?

রতন মাস্টার মৃদু হেসে বলে, এখন বিয়া করার দরকার নাই। আগে মেয়ে দ্যাখ্।

মেয়ে দেখব মানে?

ভালো মেয়ে। নিরু মেম্বারের মেয়ে।

নিরু মেম্বার কে?

দুই ইউনিয়ন পর বিরামপুর ইউনিয়নের মেম্বার। মেলা টাকা পয়সার মালিক। তার কাছে আমাগো জমি বন্ধক রাইখা তোর বুইনরে বিয়া দিছি।

কই, আমি তো জানলাম না তো?

তোরে জানাই নাই, তুই মনে কষ্ট পাবি দেইখা।

জমি বন্ধক রাখার ব্যবসা করলে সেই মানুষ ভালো হবে না বাবা।

আবার মন্দও না। মানুষের আপদে বিপদে হেই টাকা দিয়া সবাইরে সাহায্য করে। অন্যরা তো মানুষরে আরও বেশি ঠকায়।

না বাবা, আমি রাজি না। নতুন চাকরিতে ঢুকছি, এখন নিজেরই চলে না, বিয়ে করব কি?

তোর এখন বিয়া করা লাগবে না। খালি মেয়েডারে দ্যাখ্। পছন্দ হইলে পরে বিয়া করিস।

ইমরান জোর দিয়ে বলে, না বাবা, আমি পারব না।

আমি নিরু মেম্বাররে কথা দিছি।

আমারে না জানিয়ে কথা দিয়েছ ক্যান?

তুই তো বুঝস্ বাবা। গ্রামে থাকি, গ্রামের সবাইর সাথে তাল মিলাইয়া চলা লাগে। হে আইসা হেডমাস্টার সাহেবরে ধরল। হেডমাস্টার সাবে এমনভাবে বলল, নিষেধ করবার পারি নাই। তাছাড়া নিরু মেম্বারের মেয়েডা নাকি দ্যাখতে শুনতে ভালো। ভদ্র নম্রও আছে।

না না বাবা, আমি পারব না। আর তুমি এত কিছু জানলে কীভাবে? তোমার তো জানার কথা না। এ বিষয়ে আমাকে আর কিছু বলবে না।

কথাগুলো বলে ইমরান উঠে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর পেরে উঠে না। তার মা, ছোট বোন এমনভাবে তাকে বোঝায় যে তার 'না' বলতে কষ্ট হচ্ছিল। মেয়েটার নাম যে 'পরী' ততক্ষণে

সে সেটা জেনে গেছে। পরীকে না দেখলে নাকি তার বাবার মান-সম্মান শেষ হয়ে যাবে, হেডস্যার আর নিরু মেম্বারের সামনে মুখ দেখাতে পারবে না - এরকম বললে দোটানায় পড়ে যায় ইমরান ।

ইমরানের প্রথম থেকে কোনো আগ্রহই ছিল না। কিন্তু 'পরী' নামটা শোনার পর থেকে সে নিজের মধ্যে কেমন যেন পরিবর্তন উপলব্দি করে। নামটা শুনতে তার এতটা ভালো লাগছিল যে মনে হচ্ছিল একবার পরীকে দেখে। কিন্তু বিয়ের ইচ্ছে না থাকায় সে মন থেকে যেমন সায় পাচ্ছিল না তেমনি

রাজিও হচ্ছিল না। অবশেষে স্কুলের হেডমাস্টার যাকে সে হেডস্যার বলে, নিজে এসে বললে তখন আর তার পক্ষে না বলা সম্ভব হলো না। কারণ স্কুলের হেডস্যার তার নিজেরও শিক্ষক। শেষে সবাইকে খুশি রাখতে তাকে সম্মতি জানাতেই হলো।

নিরু মেম্বারের বাড়ি পৌঁছাতে দুপুর পার হয়ে যায়। বাড়ির ভিতরের আয়োজন দেখ ইমরানের মনে হয়েছে বুঝি বিয়ের আয়োজন। বাড়িটাতে কলাগাছের গেট করা হয়েছে। সেখানে রঙ বেরঙের কাগজ কেটে লম্বা দড়ির সাথে ঝুলিয়ে বাড়িটাকে সাজানোও হয়েছে। এরকম আয়োজন দেখে খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে ইমরান। তার বার বার মনে হতে থাকে নিরু মেম্বারের বাড়ি ছেড়ে সে তখনই পালায়। কিন্তু মাথাটা ঘুরে যায় যখন সে পরীকে দেখে। তার বাবা বলেছিল পরী দেখতে শুনতে ভালো। কিন্তু পরী যে কতটা সুন্দর তা না দেখলে কখনোই বুঝতে পারত না। ইমরান যে খুব ভালোমতো দেখেছে তা নয়। হলুদ শাড়ির ঘোমটার আড়ালে শুধু কাচা-হলুদ রঙের অপূর্ব সুন্দর মুখটা দেখেছে সে। তাও মাত্র একবারের জন্য। তখন থেকেই চোখের সামনে পরীর চেহারাটা ভাসতে শুরু করে। কিন্তু পরীর চেহারাটা যে কেমন তা আর সে মনে করতে পারছিল না। শুধু এটুকু মনে করতে পারছিল যে সে এক অপূর্ব সুন্দর পরীকে দেখেছে। পরীটা এত সুন্দর যে তার বার বার দেখতে ইচ্ছে করছিল।

পরীকে পছন্দ হয়েছে জানতে পেরে নিরু মেম্বার অদ্ভুত একটা প্রস্তাব দেয়। তার মেয়ের বিয়েটা আজই সে দিয়ে দিতে চায়। গ্রামের বখাটে ছেলেরা নাকি খুব বিরক্ত করছে। ইমরান আপত্তি করলেও তা ধোপে টিকেনি। হেডস্যার নিজেই এগিয়ে এসে বলেন, এত সুন্দর মেয়ে পাবে কোথায়? বিয়েটা করে ফ্যালো।

ইমরান অসম্মতি জানিয়ে বলে, স্যার, মেয়ের বয়স কম।

হতে পারে, গ্রামের মেয়ে তো।

আঠার বছরের কম মেয়েকে বিয়ে করা ঠিক হবে না।

মেয়ে রাজি হলে দোষের কি? তাছাড়া মেয়েরে অভিভাবক যেখানে রাজি সেখানে প্রশ্ন থাকবে কেন?

ইমরান মাথা নেড়ে বলে, স্যার আসলে আমি কখনও বিয়ের কথা চিন্তা করিনি।

চাকরি করছ, সমস্যা কোথায়? আপাতত বিয়ে সেরে নাও, মেয়েকে না হয় কিছুদিন পরে তুলে নিও।

আমার আরও সময় দরকার স্যার।

হেডস্যার তখন জোর গলায় বলে, সুযোগ হাতছাড়া করো না। ভালো পরিবারের ভালো মেয়ে। দ্যাখতে শুনতেও ভালো। তার উপর শিক্ষিত, এইচএসসিতে পড়ে। পরীর মতো মেয়েরে বিয়ে করার জন্য দ্যাশে ছেলের কিন্তু অভাব হবে না। শেষে দ্যাখবা সব গ্যাছে।

ইমরান উপলব্দি করে তার হেডস্যার কথাটা মিথ্যা বলেননি। পরীর মতো মেয়ের জন্য কখনোই ছেলের অভাব হওয়ার কথা না। বরং পরীর উপযোগী আর মানানসই ছেলে খুঁজে পাওয়াই কঠিন। তার নিজেরই সন্দেহ হতে থাকে পরীর মতো অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের বর হওয়ার যোগ্য সে কিনা? না, মোটেও না। সে খুব সাধারণ একটা ছেলে। মাঝারি উচ্চতার, শ্যামলা গায়ের রঙ। চাকরিটাও বড় কিছু না, বেসরকারী ব্যাংকে ক্যাশিয়ারের চাকরি। সরকারী চাকরি হলে না হয় কথা ছিল। তার বাবাও বিখ্যাত কেউ না। সামান্য স্কুল মাষ্টার, অর্থ-কড়িও নেই। বড় মেয়েকে বিয়ে দিতে জমি বন্ধক রাখতে হয়েছে। ইমরানের পড়ার খরচ দিতে না পারায় পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। শেষে নিজে টিউশনি করে কোনো মতে বিকম পাস করেছে। ছোট বোনটার বিয়ের সময় কী হবে তা আর ভাবতে চাচ্ছে না সে।

ইমরান সত্যি শঙ্কিত ছিল এই ভেবে যে তখন সে পরীকে বিয়ে না করলে পরীকে আর বিয়ে করতে পারবে না। সিদ্ধান্ত দিতে সে যখন ইতস্তত করছিল তখন তার হেডস্যার নিজেই জোর করে সম্মতি দিয়ে দিলেন। বিয়ের আয়োজন আগে থেকেই ছিল। বাকি ছিল শুধু কলমা পড়ার কাজটুকু। সেটুকু হতে সময় লাগল না। কবুল বলার সময় তার আর পরীর মধ্যে একটা রঙীন কাপড় ছিল। ওপাশ থেকে পরী কবুল বলেছে কি বলেনি সেই শব্দ ইমরানের কানে আসেনি। কে যেন বলে উঠেছিল, মেয়ে কবুল বলেছে, কবুল বলেছে। ব্যাস তাতেই বিয়ে শেষ।

বিয়ের পর আর একটা সিদ্ধান্ত হয়। আর তা হলো মেয়েকে আজই তুলে আনা হবে। আগ্রহটা ইমরানের বাবা রতন মাস্টারেরই বেশি ছিল। কারণ ইমরানের মা আর ছোট বোন ছেলে বৌকে দ্যাখেনি। তাই তারা বারবার ছেলে বৌয়ের চেহারা দেখতে চাওয়ার জন্য ফোন করছিল এবং বৌকে নিয়ে আসতে বলছিল। শেষে কেন যেন ইমরানও আর অমত করেনি।

নিরু মেম্বার আগে থেকেই ভ্যান ঠিক করে রেখেছিল। সন্ধ্যার পর গ্রামের পথ দিয়ে নতুন বিয়ে করা বউ নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না- এরকম মতামত ছিল নিরু মেম্বারের। গ্রামের পথ ঘাটে ভূত-প্রেত, জ্বীন থাকে। বিশেষ করে চলার পথে নৌকায় করে একটা খাল পার হতে হয়, ঐ খালের পাড়ে বাঁশঝাড়ে জ্বীন থাকার জোর প্রামণ আছে। তাই তার তাগাদা ছিল। তারপরও রওনা দিতে দেরি হয়ে যায়। পরীর সঙ্গী হয় তার বারো বছরের ছোট বোন জরি।

ছাউনিওয়ালা ভ্যানে রওনা দেয় সবাই। পরীর ভ্যানে জরি আর বড় একটা ব্যাগ থাকায় জায়গা হয়নি ইমরানের। সে ছিল অন্য এক ভ্যানে। এজন্য বিয়ের পর পরীর মুখটা একবারের জন্য হলেও দেখতে পায়নি। নৌকায় উঠার সময় বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পরীর লম্বা ঘোমটার জন্য সেবারও সম্ভব হয়নি। পরী প্রথম থেকেই ছিল লাজুক এবং নির্বিকার। এমনকি খাল পার হওয়ার সময় নৌকাটা খালের মাঝে বড় একটা ডালে আটকে গেলে সবাই যখন জ্বীনে আটকেছে বলে অনুমান করতে থাকে, তখনও পরী একবারের জন্যও মাথা উচু করেনি। বাড়ি এসে পৌঁছানোর পর পরীকে দেখা তার জন্য আরও দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। কারণ পরীকে নিয়ে তার ছোট বোন আর গ্রামের মহিলারা এতটাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে যে ঐ অবস্থায় পরীকে দেখার দ্বিতীয় চেষ্টা করেনি ইমরান। তবে ইমরানের খুব ভালো লাগছিল সবার মুখে মুখে পরীর সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনে। সবার কথার মর্মার্থ ছিল একটাই, 'ইমরানের বৌ ভাগ্য সত্যি ভালো, সত্যি ইমরান এক পরীকে বিয়ে করেছে। এরকম পরীর মতো বউ দশগ্রামেও নেই।'

২

ইমরান বাসর ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজার ছিটিকিনি আটকে দিল। খাটে হাটুর উপর মাথা রেখে বসে আছে পরী। পূর্বের মতোই মাথায় ঘোমটা টানা। ইমরান এক পা এগিয়ে থমকে গেল। কি কথা বলবে সে পরীর সাথে? আগে থেকে কিছু ঠিক করে রাখেনি। পরীর সাথে এখনই তার প্রথম কথা হবে। আগে কথা বলা তো দূরের কথা, পরী একবার তার চোখের দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। যে পরীকে আগে সে কোনোদিন দ্যাখেনি, যে পরীর সাথে তার একবারও চোখাচোখি হয়নি, যে পরীকে সে ভালোমতো চিনে না, জানে না, সেই পরীই কিনা আজ তার স্ত্রী এবং কিছুক্ষণ পর সেই পরীর সাথেই কথা বলতে যাচ্ছে, বাসর রাত কাটাতে যাচ্ছে। কী এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত! এই মুহূর্তটা জীবনে একবারই আসে। তার জন্য মুহূর্তটা অন্যদের থেকে অনেক অনেক আলাদা। কারণ পরী তার কাছে নতুন, এতটাই নতুন যে এর থেকে নতুন আর কিছু হতে পারে না। এত নতুন বলেই হয়তো হৃদয়ের গভীরে পরীর জন্য অজানা এক ভালোবাসা অনুভব করছে সে। ভালোবাসা কথাটা মনে হতে কেমন যেন লজ্জা পেল ইমরান। নিজেকে প্রস্তুত করতে কিছুটা সময়ও নিল সে। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে থাকল পরীর দিকে।

পরী মাথা নিচু করে আগের মতো বসে আছে। ইমরান খাটের একপাশে পরীর সামনে এসে বসল। তারপর মৃদু স্বরে ডেকে উঠল, পরী.. পরী...

পরী কোনো কথা বলল না ।

ইমরান এবার বলল, পরী তুমি সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর, আমি তোমাকে স্ত্রী হিসাবে পেয়ে সত্যি খুব ভাগ্যবান।

পরী নির্লিপ্ত, তার মধ্যে কোনোরকম চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

অতিরিক্ত লাজুক হওয়ার কারণে যে পরী এরকম নিশ্চুপ রয়েছে বুঝতে অসুবিধা হলো না ইমরানের। পরীর লজ্জা ভাঙ্গাতে সে এবার বলল, মাথা উচু করো পরী, আমার দিকে তাকাও।

পরী মাথা উচু করল না।

ইমরান বলল, পরী আমি তোমাকে মাত্র একবার দেখেছি, আর তাতে বলতে পার আমি তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছি। তুমি যে কত সুন্দর তা তুমি জান না! তুমি পরী, সত্যি পরীর মতো সুন্দর! তাকাও, একবার আমার দিকে তাকাও।

এবার পরীর মাথাটা হালকা নড়ে উঠল।

ইমরান বলল, আমি জানি আমি তোমার উপযুক্ত নই, তারপরও আমি তোমাকে পেয়েছি, কীভাবে পেয়েছি জানি না। হয়তো আমার ভাগ্যে তোমার মতো অপূর্ব সুন্দর পরী ছিল এজন্য!

কথাগুলো বলতে বলতে ইমরান পরীর মাথার ঘোমটাটা খানিকটা টেনে দিল। আর তাতে পরীর যে চেহারা সে দেখতে পেল তাতে বিস্ময়ে একেবারে থমকে গেল। তার বিস্ময়ের কারণ মূলতো দুটো। প্রথমত পরীকে সে যতটা সুন্দর দেখেছিল, তার থেকেও পরী অনেক অনেক সুন্দর। এত সুন্দর যে ইমরানের মনে হচ্ছে স্পর্শ করলেই পরীর সৌন্দর্য বুঝি মোমের মতো গলে পড়বে। এই সৌন্দর্য সে বর্ণনা করতে পারবে না। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, পরী কাঁদছে। পরীর দুচোখ বেয়ে অশ্রু নিচে গড়িয়ে পড়ছে। পরী কাঁদছে, ব্যাপারটা বুঝতেই ইমরানের বুকটা ধক্ করে উঠল। পরী কাঁদবে কেন? কেন কাঁদবে? সে কি এমন কিছু করেছে যার জন্য পরী মনে কষ্ট পেয়েছে, তার উপর রাগ করেছে, অভিমান করেছে? না তা হতে পারে না। তার পরী কাঁদতে পারে না, অন্তত আজ এই রাতে।

ইমরান নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, প..পরী, পরী তুমি কাঁদছ কেন?

পরী কিছু বলল না। শুধু নিজের হাত দুটোর দিকে তাকাল।

ইমরান লক্ষ্য করল পরীর হাত দুটো ধীরে ধীরে কাঁপছে। প্রথমে সে ভেবেছিল সে বুঝি ভুল দেখছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরই বুঝল সে ভুল দেখছে না, সত্যি পরীর হাত দুটো কাঁপছে। তার থেকেও ভয়ংকর কথা পরীর চেহারাতে কেমন যেন পরিবর্তন আসছে। মনে হচ্ছে কেউ বুঝি পরীকে ভয়ংকর যন্ত্রণা দিচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা সহ্য করতে চেষ্টা করছে পরী। কিন্তু পারছে না। পারছে না বলেই পরীর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে পানি বেরিয়ে আসছে।

হতভম্ব ইমরান তোতলাতে তোতলাতে বলল, এ.. এ...রকম করছ কেন পরী?

পরী কোনো কথা বলতে পারল না। তার চোখ দুটোতেও এখন পরিবর্তন আসছে, ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করেছে।

ইমরান সত্যি ভয় পেয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগের অপূর্ব সুন্দর পরীর এ কি ভয়ংকর চেহারা! পরীকে এখন চেনাই যাচ্ছে না। পরীর মুখটা এমন বিশ্রীভাবে বিকৃত হয়েছে যে দেখলে ভয় লাগছে। তার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে নিজের শরীরের উপর পরীর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

ইমরান সাহস করে পরীর হাত দুটো ধরল। আর তাতে অতিরিক্ত চাপে প্রত্যেক হাতে দুই পাশে সোনার বালার মধ্যে যে কাঁচের চুরিগুলো ছিল সেগুলো মট্‌মট্ করে ভেঙ্গে গেল। পরীর শরীরের তীব্র কম্পন এখন স্পষ্টভাবে অনুভব করছে ইমরান। সে যতই পরীর হাত চেপে পরীকে স্থির রাখার চেষ্টা করছে পরীর শরীর ততই কাঁপছে। এক পর্যায়ে ইমরান আর পারল না। ছেড়ে দিল পরীর হাত দুটো। আর তখনই পরী দুহাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

ইমরান ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে গেল। পরী অবশ্য খাট থেকে নামতে পারল ন। সে ধপ করে খাটের উপর পড়ে গেল। তারপর কাটা মুরগীর মতো ছটফট করতে লাগল। তার মুখ দিয়ে তখন গো গো ভয়ংকর শব্দ বের হচ্ছে।

ইমরান তাড়াতাড়ি দরজা খুলে সবাইকে ডাক দিল। সবাই এসে পরীর অবস্থা দেখে উল্টো ভয়ে কয়েককদম পিছিয়ে গেল। সবাই অনুমান করল কান্ডটা কোনো ভূত-প্রেত কিংবা জ্বীনের। পরীর ছোট বোন জরি তো চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। তার চোখের সামনে পরীর শরীরটা অদ্ভুতভাবে বেঁকে আবার সোজা হয়ে যাচ্ছে। আগে কখনও তার বোনকে জরি এরকম করতে দেখেনি।

ঠিক যেভাবে হঠাৎ পরীর শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়েছিল, একইভাবে হঠাৎ করে কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেল। তীব্র ক্লান্তিতে পরীর সমস্ত শরীরটা ঘেমে উঠেছে। নিশ্বাসের সাথে এখন শরীর উঠানামা করছে। বোঝা যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে তাকে ভয়ংকর কোনোকিছুর সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু কী সেটা? ভাবতে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল ইমরান।

ইমরানের মা রত্না বেগম নিজেও এতক্ষণ সবকিছু দেখছিল। পরীর শরীরটা স্থির হয়ে এলে সে ইমরানের ছোট বোন মিতুকে বলল, পানি নিয়ে আয় পানি। বৌমার মাথায় পানি দিয়া লাগবে।

মিতু তাড়াতাড়ি পানি আনতে গেল।

রত্না বেগম এবার ইমরানের কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কী বউ বিয়া করলি? মনে তো হয় ওরে ভূত পেত্নিতে ধরছে।

কী সব বলছ মা?

তাড়াতাড়ি পরীগো বাড়িতে খবর দে। দেরি করিস না।

কেন?

কোনো অঘটন ঘটলে বিপদে পড়বি। তোর কপালডা যে এত খারাপ হবে ভাববারও পারি নাই।

মা তুমি অহেতকু চিন্তা করছ।

রত্না বেগম হালকা ধমকের স্বরে বলল, আমি ঠিকই চিন্তা করতেছি। সময় হইলে বুঝবি। আর দেরি করিস না। পরীগো বাড়িতে খবর দে। কাইল আবার সবকিছু গ্রামে ছড়ায় না যায়।

কী ছাড়াবে?

রাত্না বেগম বিরক্ত হয়ে বলল, তুই কিছুই বুঝস না। ভূতে ধরা বউ বাড়িতে নিয়া আইছি। এই কথা রাষ্ট্র হইলে আর মান-সম্মান থাকবে?

ঘটনার আকস্মিকতায় রতন মাস্টার একেবারে হতবিহ্বল হয়ে গেছে। সে কোনো কথাই বলতে পারছে না। সবাই যে তার ভুল উপলব্দি করছে সে। নিরু মেম্বার যে তার সাথে এরকম একটা কাজ করবে ভাবতেই পারছে না। তাছাড়া নিরু মেম্বারের মেয়েরে ভূতে ধরেছে এই কথাটা চাপা ছিল কীভাবে সেটাও তার কাছে একটা প্রশ্ন। গ্রামের কাউকে ভূত, পেত্নিতে ধরলে তা ছড়িয়ে পড়তে একটা দিনেরও প্রয়োজন হয় না। তারপর হয় মানুষজনের আসা। জন্ম হতে একটার পর একটা আজগুবি গল্প, যে যার মতো বলতে থাকে। যা ঘটেছে তা যেমন বলে, যা ঘটেনি তাও বলে। সবগুলো মর্মার্থ দাঁড় করালে এক সময় দেখা যাবে ভূত, প্রেত, জ্বীন-পরী, রাক্ষস খোক্ষস, কোনোকিছুর গল্প ছড়াতে বাদ থাকেনি।

সকালে সত্যি সত্যি পরীর অসুস্থতার কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। সবার মধ্যে যে কথাটা ছড়াল সেটা হলো পরীকে খুব খারাপ জ্বীনে ধরেছে, রাতে ঐ জ্বীন ইমরানকে হত্যা করতে চেয়েছিল। ইমরান কোনোমতে বেঁচে গেছে। সুযোগ পেলে পরী এখন যে কাউকে হত্যা করবে। রাতে নাকি তাকে গ্রামের বাঁশঝাড়ে হাঁটতে দেখা গেছে, পুকুর থেকে ধরে কাচা মাছও খেতে দেখা গিয়েছে।

এই গল্পগুলো মানুষকে অবিশ্বাস করান সম্ভব হতো, কিন্তু সকালে নিরু মেম্বার আসার পর পরী যা করল তাতে সবাই নিশ্চিত হলো সত্যি সত্যি পরীকে জ্বীনে ধরেছে। রাতে সংবাদ শুনে সকাল সাতটার দিকে নিরু মেম্বার ইমরানদের বাড়িতে আসে। নিরু মেম্বারকে দেখে ভয়ানকভাবে ক্ষেপে উঠে পরী। এক পর্যায়ে নিজের পায়ের স্যান্ডেল খুলে মারে নিরু মেম্বারের প্রতি। তারপর আবার গত রাতের মতো কাঁপতে শুরু করে শরীর। একসময় ঘাম ছেড়ে কমে যায় কাঁপুনি।

পরীর এই আচরণে ইমরানও মর্মাহত হয়েছে। সে নিশ্চিত হয়েছে পরীর আচরণ স্বাভাবিক না। পরীর বড় ধরনের কোনো মানসিক সমস্যা আছে। আবার জ্বীনের ব্যাপারটাও উড়িয়ে দিতে পারছে না, হতে পারে সত্যি সত্যি পরীকে জ্বীনে ধরছে। যদিও ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে, আবার এড়িয়েও যেতে পারছে না। এ কারণে প্রচন্ড একটা মনসিক অশান্তি তাকে একেবারে অস্থির করে তুলল।

ইমরানের মা কিছুতেই পরীকে তাদের বাড়িতে রাখতে রাজি হলো না। তার ভয় জ্বীন যে কোনো সময় তার ছোট মেয়ে মিতুর উপর চেপে বসতে পারে। তাছাড়া জ্বীন যে ইমরানকেও মেরে ফেলতে পারে এই আশংকাও তার প্রবল। তার অতিরিক্ত পীড়াপীড়ির কারণে দুপুরের পর নিরু মেম্বার পরীকে নিয়ে তার বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দিল। যাওয়ার সময় সে সবাইকে তার বাড়িতে

দাওয়াত করল। তবে তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হলো এ বাড়ি থেকে কেউ কোনোদিন আর ঐ বাড়িতে যাবে না, কারণ নীরু মেম্বার সবার সাথে মিথ্যা বলেছে, প্রতারণা করেছে।

নীরু মেম্বার কষ্টটা বুকের মধ্যে চেপে রেখে পরী আর জরিকে নিয়ে চলে গেল। অবশ্য নীরু মেম্বারের থেকেও বেশি কষ্ট পেল ইমরান। পরীর এ চলে যাওয়াটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে। তার বার বার মনে হচ্ছে কোথায় যেন অনেক বড় একটা ভুল হচ্ছে। কিন্তু ভুলটা যে কি সে তা বুঝতে পারছে না। আর বুঝতে পারছে না বলেই তার কষ্ট আর অস্থিরতা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে। একসময় সে বুঝতে পারল পরী অসুস্থ হোক, পাগল হোক কিংবা তাকে জ্বীনে ধরুক, পরীকে ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না। কারণ পরী তার স্ত্রী এবং পরীকে সে ভালোবাসতে শুরু করেছে।

৩

বিছানায় শুয়ে ইমরান ছটফট করছে। সে ঘড়ি দেখল, সময় রাত সাড়ে এগারোটা। তার ঘুম আসছে না। দুপুরে পরী চলে যাওয়ার পর থেকে তার কাছে সবকিছু কেমন যেন শূন্য শূন্য মনে হচ্ছে। কয়েকবার ভেবেছে সে পরীদের বাড়ি চলে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস করে বাড়ির কাউকে বলতে পারেনি। কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার? গতকাল সবাই পরীর পক্ষে ছিল, আর আজ কেউ পরীর পক্ষে নেই। ব্যাপারটা কিছুতেই সে মেনে নিতে পারছে না। তার কেন যেন মনে হচ্ছে পরী মেয়েটা এখন সবচেয়ে অসহায়, স্বামী হিসেবে এখন অবশ্যই তার পরীকে সাহায্য করা উচিত, পরীর পাশে দাঁড়ান উচিত। তার নিজের কাছে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। পরীকে এ বাড়িতে রেখে দেয়ার পিছনে সে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। পরী তার বিবাহিত স্ত্রী, পরীর উপর তার অধিকার আছে। অথচ সেই অধিকার সে খাটায়নি। বিয়ের পর স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার সবচেয়ে বেশি। স্ত্রীরও স্বামীর উপর দাবী সবচেয়ে বেশি থাকে। অথচ সেই দাবী সে পূরণ করতে পারেনি। চলে যাওয়ার সময় পরী তার সাথে কোনো কথাও বলেনি। শুধু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল পরী যেন তাকে কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছিল না।

ইমরান ভেবে দেখল, পরীর সাথে এখন পর্যন্ত তার কোনো কথা হয়নি। কী অদ্ভুত একটা ব্যাপার! বিবাহিত স্ত্রীর সাথে সে বাসর ঘরে পর্যন্ত অবস্থান করেছে অথচ কথা হয়নি। এমন যদি হতো পরীকে সে অপছন্দ করে তাহলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু সেরকম কিছু নয়। বরং সময় যত গড়াচ্ছে সে অনুধাবন করছে পরীকে ততই সে পছন্দ করতে শুরু করেছে। পরী যেন ধীরে ধীরে তার অস্তিত্বের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। অথচ আশেপাশের সবাই তাকে পরীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে যাচ্ছে। রাতে ঘুমানোর আগে একসময় তো পরীকে তালাক দেয়ার কথাও উঠে। কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছিল না বলে সে উঠে এসেছে।

শেষ রাতে ইমরান এক দুঃস্বপ্ন দেখে বিছানায় উঠে বসল। পরীকে ঘরের মধ্যে খাটের পায়ার সাথে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। লম্বা সাদা চুলের একজন মানুষ চাবুকের মতো কিছু একটা দিয়ে নির্দয়ভাবে পরীকে পিটাচ্ছে। পরী চিৎকার করে কাঁদছে। এক পর্যায়ে সে খুব অনুরোধ করে বলছে তাকে যেন তার স্বামীর কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না। এমন কি তার বাবা মাও না। বরং তারা তাকে মারার জন্য বেশি বেশি উৎসাহ দিচ্ছে। অত্যাচারের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে পরী একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আর তখনই ঘুম ভেঙ্গে যায় ইমরানের।

ইমরান বিছনায় চুপচাপ বসেছিল। সে সিদ্ধান্ত নেয় সকালে সে পরীদের বাড়ি যাবে। যদিও একদিন ছুটি বাকি আছে, জরুরী ঢাকা যেতে হবে বলে সে গোপনে পরীদের বাড়ি যাবে। তারপর পরীর সাথে সবকিছু নিয়ে নিরিবলি কথা বলবে। তার বিশ্বাস, পরী তার সাথে কথা বললে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। এরকম একটা পরিকল্পনা দাঁড় করানোর পর সে বিছানা ছাড়ল। হাত-মুখ ধূয়ে, ওযু করে মসজিদে গেল। নামায পড়ে বাড়ি ফিরে পরিকল্পনামতো ঢাকার জরুরী কাজের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। এতে অবশ্য বাড়ির সবাই বেশ খুশিই হলো। তারা এই ভেবে প্রশান্তি অনুভব করল যে ইমরান ঢাকায় গেলে দ্রুত পরীর কথা ভুলে যাবে এবং ইমরানকে প্রয়োজনে আবার বিয়ে দেয়া যাবে।

ইমরান ভেবেছিল শ্বশুর বাড়ি এলে সে যথাযথ ব্যবহার পাবে না। কারণ তাদের বাড়িতে গতকাল কাউকে সমাদর করা হয়নি। তার ধারণা অবশ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলো। তাকে সবচেয়ে

সুন্দর ঘরটি দেয়া হলো, পুকুরে জাল ফেলে বড় মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হলো, একটা খাসি জবেহ করা হলো, পোলাও রান্নার পাশাপাশি জলি দুধের পায়েসের আয়োজনও থাকল। দুপুরে খাওয়ার সময় গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বীকেও দাওয়াত করা হলো। সবকিছু মিলিয়ে আয়োজন মন্দ না। অবশ্য ইমরান এগুলোর কোনোকিছুর প্রতিই আগ্রহ অনুভব করল না। তার সকল আগ্রহ আর চিন্তা-ভাবনা পরীকে নিয়ে। অথচ সেই পরীর সাথে সে সাক্ষাৎ করতে পারেনি। কয়েকবার তার শ্বশুর নিরু মেম্বারকে পরীর কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলেছে, 'পরী তার ঘরে আছে, পরীর চিকিৎসা চলতেছে, পরী ঠিক হয়ে যাবে, তুমি কোনো চিন্তা করবা না বাবা। ভূত- প্রেত, জ্বীন যাই থাকুক পরীর কিছু করবার পারবে না।'

ইমরান দুপুরে তেমন কিছু খেতে পারল না। আনুষ্ঠানিকতার জন্য সে শুধু তরকারিগুলো নিয়েছে আর পরখ করে দেখেছে। এর বেশি কিছু না। দুপুরের আগে যতটুকু রুচি তার ছিল তা তিরোহিত হয়েছে ঘরের মধ্যে পরীর চিৎকার শুনে। তার মনে হচ্ছিল পরীর উপর ভয়ানক অত্যাচার করা হচ্ছে। এরপর যখন দেখল লম্বা সাদা চুলের মাঝবয়সী একজন মানুষকে বাড়িতে বিশেষ খাতির করা হচ্ছে তখন সে সত্যি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। কারণ এই রকম একজন মানুষকেই সে শেষ রাতে স্বপ্ন দেখেছিল। লোকটির পরিচয় জানার চেষ্টা করতে নিরু মেম্বার বলল, উনি হইল জব্বার ফকির। ভূত- প্রেত, জ্বীন তাড়াতে বড় ওস্তাদ। সবাই তারে ফকির বাবা বইলা চিনে-জানে। চার ইউনিয়ন পর তার আস্তানা। সেখান থাইকা তারে নিয়া আসা হইছে। সকালে আইসা পৌঁছাইছে। পরীরে দেইখা বলছে পরীর উপর খারাপ জ্বিনের নজর পড়ছে। সকালে মরিচ আর সরিষা পড়া দিয়া জ্বীনরে তাড়ানোর চেষ্টা করা হইছে। শক্ত জিন, তাড়ান যায় নাই। এক কেজি মরিচ পুড়াইলেও জ্বীন একটুও নড়ে নাই। দুই কেজি সরিষার ঝালও জ্বীনের কিছু করবার পারে নাই। পরে জ্বীনরে ঝাড়ু দিয়া পিটান হইছে। তাতে জ্বীন চইলা গেলও সন্ধ্যায় নাকি আবার আসবে। রাইতে ফকির বাবা নিজে পরীর সাথে একঘরে থাকবে। জ্বীন আসার সাথে সাথে জ্বীনরে আটকায় ফেলাবে। কাইল সকালে পরী এক্কেকবারে ঠিক হইয়া যাবে।

কথাগুলো পছন্দ হলো না ইমরানের। সে বলল, আমি পরীর সাথে দেখা করতে চাই।

নিরু মেম্বার বলল, আইজ দেখা করা নিষেধ, আইজ সারাদিন পরী জব্বার ফকিরের অধীন থাকবে। কাইল সকালে দেখা করা যাবে।

ইমরান বিস্মিত হয়ে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারব না!

অবশ্যই পারবা। তয় আইজ না।

ইমরান এবার জোর দিয়ে বলল, না আমি আজই দেখা করব এবং এখনই। আর পরীর সাথে বাইরের কোনো মানুষ রাতে থাকতে পারবে না, পরী আমার স্ত্রী।

নিরু মেম্বার জিহ্বা কাঁমড়ে বলল, ছিঃ কি বলছ বাবা! জব্বার ফকির গুনী মানুষ, সবাই তারে শ্রদ্ধা-সম্মান করে, হে বাইরার মানুষ হবে কেন! আমিই তো তারে নিয়া আইছি। তয় তুমি পরীর সাথে দেখা করবার চাইলে ফকির বাবার অনুমতি নিয়া লাগবে। আমি অনুমতি নিয়া আসি।

ইমরান খানিকটা উচু গলায় বলল, আমার স্ত্রীর সাথে সাথে দেখা করতে আমার ঐ ফকিরের অনুমতি লাগবে! কী বলছেন আপনি? নাকি ঐ ফকিরের উচিত ছিল আমার অনুমতি নেয়ার?

নিরু মেম্বার ভয় পেয়ে বলল, তা নিত, কিন্তু তোমরা তো পরীরে বাড়ি থাইকা বাইর কইরা দিছ। এইজন্য ফকির বাবা আমার অনুমতি নিছে। এখন তুমি পরীর সাথে দেখা করলে ফকির বাবা যদি চইলা যায়?

গেলে যাবে।

তাইলে পরীর কী হবে?

আমি পরীকে ঢাকা নিয়ে যাব, সেখানে পরীর চিকিৎসা করাব।

জব্বার ফকির খানিকটা তাচ্ছিল্য করে বলল, ঢাকায় কি জ্বীনের ডাক্তার আছে নাকি?

কথাগুলো ইমরানের ভালো লাগল না। অবশ্য জব্বার ফকিরকে প্রথম থেকেই ভালো লাগেনি তার। পেটমোটা, ছোটখাট কালো শরীরের মানুষটিকে কেন যেন তার অতিচালাক আর ধূর্ত মানুষ বলে মনে হয়েছে। নিজের শ্বশুর হিসেবে সে কখনোই মানানসই নয়। কিন্তু শুধু পরীর জন্য সে সবকিছু মেনে নিয়েছে।

ইমরান বলল, হ্যাঁ ঢাকায় জ্বীনের ডাক্তার আছে, তার কাছেই নিয়ে যাব।

তাইলে নিয়া যাও, এখনই নিয়া যাও। আমার কাছে রাখা দরকার কি? আর যদি আমার কাছে রাখো তাইলে ফকির বাবার কথা শোনা লাগবে। নিজের মেয়ে হলেও আমি তো জ্বীনে ধরা কাউরে বাড়িতে রাখবার পারি না। আমার ছোট আর একটা মেয়ে আছে, ওর ভবিষ্যৎ আছে, ওরে বিয়া দিয়া লাগবে।

ইমরানের কিছু কড়া কথা বলতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু সে বলল না। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল। তারপর অনেকটা জোর করে ঢুকে গেল পরীর ঘরের মধ্যে। সে যা দেখল তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। পরী বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার হাত দুটো গামছা দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা। হাতের দু'পাশে কালচে অনেক দাগ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ঝাড়ুর পাশাপাশি মোটা লাঠি দিয়েও পেটান হয়েছে পরীকে। সম্ভবত দাগগুলো পিঠেও আছে। কাপড়ের কারণে দেখা যাচ্ছে না। মাথার পাশে অনেকগুলো কাসার বাটিতে সরিষার তেল রাখা। তেলের ঝাঝে পরীর চোখে পানির দাগ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সাথে শুকনো মরিচ পোড়ার গন্ধও আছে। মরিচ আর তেলের ঝাঝ এত তীব্র যে ইমরানের চোখ দিয়েও পানি বেরিয়ে এসেছে। এরকম একটা পরিবেশে পরী কীভাবে বেঁচে আছে ভাবতে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল ইমরান।

ইমরান দ্রুত পরীর হাতের বাঁধন খুলে দিল। পরী আড়চোখে ইমরানকে দেখে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল। ইমরানের কেন যেন মনে হলো অভিমান করে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে পরী। তার বুকটা হু হু করে উঠল। সে খানিকটা ঝুকে এসে বলল, পরী, তুমি চিন্তা করো না, আমি তোমাকে ঢাকায় নিয়ে যাব এবং তা আজই।

দরজার পিছনে নিরু মেম্বার দাঁড়িয়েছিল। ইমরানের কথা তার কানে গেছে। সে বলল, না আজ পরী যাবার পারবে না। ফকির বাবা নিষেধ করছে।

ইমরান এবার মাথা ঘুরিয়ে নিরু মেম্বারের দিকে তাকাল। তারপর জোর দিয়ে বলল, আমি পরীকে নিয়ে যাবই।

তুমি তা করতে পার না।

অবশ্যই পারি।

আমি ওকে যেতে দেব না।

আমি ওকে নিয়ে যাবই।

তাইলে পরী আর সুস্থ হবে না।

ওকে সুস্থ করার দায়িত্ব আমার।

আগেই বলছি তুমি পারবা না। জ্বীন তাড়াবার...

কথা শেষ করতে পারল না নিরু মেম্বার। তার আগেই মাথার পাশে থাকা তেলের একটা বাটি নিরু মেম্বারের দিকে ছুড়ে মারল পরী। নিরু মেম্বার বিস্মিত হয়ে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল পরীর দিকে। তারপর ধীর পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

একটা ছাউনিওয়ালা ভ্যানে করে ইমরান যখন পরীকে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে এলো তখন পড়ন্ত বিকেল। পুরোটা পথে পরী কোনো কথা বলেনি। অতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে সে ইমরানের কাঁধে মাথা রেখে বসেছিল। ইমরান পরীর দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। কারণ একদিনেই পরীর চেহারার যে অবস্থা হয়েছে তাতে সে খুব অপরাধবোধে ভুগছিল। পরীর চেহারার উজ্জ্বলতা আজ অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে দগদগে দাগ। এই দাগ ঢাকতে পরী বোরকা পরে এসেছে। বোরকা পরার ব্যাপারটা ভালো লাগছিল না ইমরানের। কিন্তু কোনো উপায়ও ছিল না, ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে সে।

বাসস্ট্যান্ডে এসে ইমরান ঢাকার বাসের টিকিট কাটল। পরিবহনের বাস এখন থেকে ছাড়বে এবং সরাসরি ঢাকা যাবে, ঘণ্টা তিনেক সময় লাগবে। টিকিট কেটে বাসে উঠার কিছুক্ষণ পর কয়েকজন পুলিশ বাসে উঠল। পুলিশ দেখে পরী যেন খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মনে হয়েছে সে ভয় পেয়েছে এবং কিছু বলতে চায়। শেষে বিড় বিড় করে বলল, আমরা পরের বাসে যাব, এই বাসে যাব না।

ইমরান জীবনে পরীর প্রথম কথা শুনল। তার খুব ইচ্ছে করছিল জানতে কেন পরী পরীরের বাসে যেতে চাচ্ছে? কিন্তু সে প্রশ্নটা করল না। পরী তার কাছে প্রথম যে ইচ্ছে প্রকাশ করেছে সেটা তার পালন করা উচিত - এরকম চিন্তা থেকে দ্বিতীয় বাসে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল ইমরান।

দ্বিতীয় বাসটি ছাড়ল বিশ মিনিট পর। বাসটি প্রায় ত্রিশ মিনিট পর একটা ব্রিজের কাছে এসে থেমে গেল। থামার কারণ জানতে সামনে বসা এক প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে সে যে উত্তর পেল তাতে তার রক্ত হিম হয়ে আসার উপক্রম হলো। প্রথম যে বাসটিতে সে উঠার পরিকল্পনা করেছিল সেটি অন্য একটি বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের পর ব্রিজ ভেঙ্গে নিচে পড়েছে। এতে প্রায় সকল যাত্রীর মৃত্যু ঘটেছে, যে কয়েকজন বেঁচে আছে তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন। বাসটি এখনও পানির নিচে।

ইমরান অনুমান করল প্রথম ঐ বাসটিতে রওনা দিলে তারাও মারা যেত পারত। বলতে গেলে অল্পের জন্য তারা বেঁচে গেছে এবং তা পরীর কারণে। তাহলে পরী কী ব্যাপারটা আগে থেকে জানত? তা কী করে হয়? আর যদি সত্যি না জানত তাহলে প্রথম বাসে উঠার পর নেমে গিয়েছিল কেন? এরকম ভাবতে সে নিজের মধ্যে অজানা এক শিহরণ অনুভব করল। তারপর ধীরে ধীরে তাকাল পরীর দিকে, দেখল পরী তার কাঁধে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। এখন পরীকে সত্যি অনেক সুন্দর লাগছে!

সারাদিন ইমরানের মধ্যে একটা আশঙ্কা কাজ করছিল। আর তা হলো পরীকে নিয়ে ঢাকায় সে কোথায় উঠবে, উঠার মতো ঢাকায় তার কোনো জায়গা নেই। ঢাকায় এতদিন সে একটা দোতলা বাড়িতে ছিল। বাড়িটা পুরাতন ঢাকায়, খুবই জরাজীর্ণ অবস্থা। একতলায় বাড়িওয়ালা থাকে, দোতলায় ছিল ছেলেদের মেস্। একে তো বাড়ির অবস্থা খারাপ, তার উপর বাড়িটার মালিক মানসিক রুগীর ডাক্তার। সামনাসামনি মানসিক রুগীর ডাক্তার বললেও পিছনে সবাই বলে পাগলের ডাক্তার। সবাই তাকে চিনে ডাক্তার তরফদার বলে। পুরো নাম ইমরানের জানা নেই। ডাক্তার তরফদার সারাটা জীবন মানসিক হাসপাতালের চিকিৎসক ছিলেন। মাস তিনেক হলো অবসর নিয়েছেন। এখন বাড়ি ঠিকঠাক করে একতলায় উঠেছেন। বাড়িতে উঠেই জানিয়েছেন তার দোতলাও লাগবে। বাড়ি ছাড়ার নোটিশও দিয়েছেন। দোতলায় ইমরানসহ আরও দুইজন ব্যাচেলর ছিল। একজন ছিল একটা প্রাইভেট ওষুধ কোম্পানির সেলস্ম্যান, নাম হোসেন। অন্যজন হাশমত, ফ্রিজ টেলিভিশন দোকানের ম্যানেজার। ওষুধ কোম্পানীর সেলস্ম্যান মাসের প্রথমে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। আর ফ্রিজ টেলিভিশন দোকানের ম্যানেজার হাশমত মাসের মাঝামাঝি একদিন বিকেলে এক অঘটন ঘটাতে গিয়ে ধরা খেয়ে বাড়ি ছেড়েছে। তার দুসম্পর্কের এক খালাত বোনকে নিয়ে বাসায় ঢুকার সময় সরাসরি ডাক্তার তরফদারের হাতে ধরা পড়ে সে। সাথে সাথে হাশমতকে বিদেয় করে দেন ডাক্তার তরফদার। বিদেয় করে দেয়ার সময় বলে দিয়েছেন তাদের দুজনকে যে পুলিশে দেয়া হয়নি এটা তাদের সৌভাগ্য। এরকম পাগলের ডাক্তারের বাড়িতে পরীকে নিয়ে যেতে হবে ভাবতে বুকটা দুরু দুরু করছে ইমরানের। যদি ডাক্তার তরফদারের সামনে পড়ে নিশ্চিত আজ তাদের পুলিশে দেবে।

ইমরান কয়েকবার ভেবেছে সে পরীকে নিয়ে হোটেলে উঠবে। কিন্তু হোটেলে উঠার মতো পর্যাপ্ত টাকা তার নেই। মাসের শেষ। বাড়িতে গিয়ে অতিরিক্ত টাকা খরচ হয়ে গেছে। তাছাড়া হোটেলে নানা রকম ঝামেলা হয়। সে অনেক চিন্তা করেও ঢাকায় তার কোনো আত্মীয় কিংবা বন্ধুর ঠিকানা বের করতে পারল না যার বাসায় দুই তিন রাত পরীকে নিয়ে থাকতে পারবে। পরিস্থিতি যে খুব নাজুক বুঝতে পারছে সে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে একটা নতুন বাসাও খুঁজে পেতে হবে। কারণ এক তারিখে তার পুরাতন বাসা ছেড়ে দিতে হবে। এখন পর্যন্ত বাসা খোঁজা শুরু করেনি। এটা অনেক বড় চিন্তার ব্যাপার। ঢাকা শহরে সামর্থের মধ্যে বাসা পাওয়া সত্যি কঠিন ব্যাপার। উপরন্তু পরীর চিকিৎসার ব্যাপারটা নতুন যোগ হয়েছে। পরীকে যদি সত্যি জ্বীনে ধরে থাকে এবং বাসায় উঠার পর চিৎকার চেঁচামেচি করে তাহলে বাড়ীওয়ালা দুই দিনের মধ্যে ঘাড় ধরে তাদের নামিয়ে দেবে। আর ডাক্তার তরফদারের বাড়ি হলে তো কথাই নেই, সোজা হাজতখানায়। সবকিছু মিলিয়ে তাকে যে ভালো ঝামেলা পোহাতে হবে সেটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে।

ঢাকায় এসে পৌঁছাতে রাত নয়টা বেজে গেল। পথে অ্যাকসিডেন্টের কারণে রাস্তা বন্ধ থাকায় আসতে অতিরিক্ত সময় লেগেছে। কী করবে এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি ইমরান। তাই বাসকাউন্টারের সামনে ফাঁকা প্লাস্টিকের চেয়ার পেয়ে চেয়ারের উপর পরীকে নিয়ে বসল।

পরী এখন চোখ খুললেও তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে সে খুব দুর্বল। ভয়েও আছে। কারণ পরী ডান হাত দিয়ে তার বাম হাত ধরে রেখেছে। পরীর এই হাত ধরাটা খুব ভালো লাগছে ইমরানের। তার মনে হচ্ছে পরী সারাটা জীবন তার হাত ধরে থাকুক।

ইমরান ঠিক করল সে সবকিছু পরীকে খুলে বলবে। কিন্তু কীভাবে শুরু করবে সেটা বুঝতে পারছে না। নতুন স্ত্রীর কাছে রাতে থাকার জয়গা নেই এই অক্ষমতার কথা প্রকাশ করা অনেক বড় লজ্জার কথা।

ইমরান লক্ষ্য করল পরী নিজে থেকেই তার মাথাটা আবার তার ঘাড়ে হেলিয়ে দিল। পরী যে শারীরিকভাবে খুব দুর্বল বুঝতে অসুবিধা হলো না তার। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর পরী কিছু খায়নি। বাড়িতেও সম্ভবত সারাদিন তাকে কোনো খাবার দেয়া হয়নি। কাজেই দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার কারণে পরীর শরীর দুর্বল হয়ে পড়াটা স্বাভাবিক।

ইমরান পায়ের কাছ থেকে ব্যাগটা সরিয়ে রেখে বলল, পরী কিছু খাবে?

পরী অস্পষ্ট স্বরে বলল, পানি খাব।

তুমি বসো, আমি পানি নিয়ে আসছি।

পরী চোখ তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, কোথায় পাবে পানি?

ঐ পাশে একটা দোকান আছে। বোতলে পানি কিনতে পাওয়া যায়, আমি নিয়ে আসছি।

আমি একা থাকব? আমার ভয় করছে।

ইমরানের নিজেরও পরীকে একা রেখে যেতে ভয় করছে। এরকম ব্যস্ত বাসস্ট্যান্ডে পরীকে একা রেখে যাওয়াটা যে ঠিক হবে না বুঝতে পারছে সে। কিন্তু কী করবে? যখন এরকম ভাবছে তখনই তার ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন হলো। একজন হকার পানির বোতল হাতে 'পানি পানি' বলে পানি বিক্রি করার জন্য সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সাথে সাথে সে তাকে ডাক দিল। একবোতল ঠান্ডা পানি কিনে এগিয়ে দিল পরীর দিকে। পরী বোতলে করে পানি খেতে পারল না। তার হাত কাঁপছে। ইমরান তখন বোতলের মুটকিতে পানি ঢেলে দিলে পরী কয়েক ঢোক পানি খেল। তারপর বলল, আমরা খুব দুর্বল লাগছে, চলো বাসায় যাই।

কথাগুলো বলে পরী আবার ইমরানের কাঁধে মাথা এলিয়ে দিল।

ইমরান ইতস্তত করে বলল, কো.. কোথায় যে যাই?

কেন? তোমার বাসায়। তোমার বাসা আছে না?

আ..আছে? কি..কিন্তু ওটা ডাক্তার তরফদারের বাসা।

তাতে কি?

উনি পাগলের ডাক্তার, ভয়ংকর রাগী।

রাগী হলে হবে, চলো যাই।

কি..কিন্তু..

কিন্তু কি?

কয়েকদিন আগে উনি হাশমত ভাইকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন।

কেন?

হাশমত ভাইয়ের সাথে তার খালাত বোন ছিল এজন্য।

ঠিকই করেছেন। আমাদের বের করবেন না, আমি তোমার স্ত্রী।

কি...কিন্তু বাড়ি ভাড়ার সময় বাড়ির দারোয়ান করিম চাচা জানিয়ে দিয়েছিল যে বাড়িতে মেয়েছেলে কিংবা স্ত্রীকে নিয়ে উঠা যাবে না। এটা ডাক্তার তরফদারের নাকি নির্দেশ।

তখন নির্দেশ ছিল, এখন হয়তো নেই।

আছে নির্দেশ আছে, উনি হাশমত ভাইকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন।

এ কথা আগে একবার বলেছ। আর দিয়েছেন এ কারণে যে হাশমত ভাই তার খালাত বোনকে নিয়ে আসেনি। এসেছিল বাইরের একটা মেয়েকে নিয়ে।

ইমরান চোখ বড় বড় করে বলল, তুমি জানলে কীভাবে?

আমি জানি না আমি কীভাবে জানলাম। তবে যা বলছি সত্য বলছি।

তুমি কি হাশমত ভাইকে চিনতে?

না চিনতাম না, এখনও চিনি না। ঐ মেয়েটাকেও চিনি না।

তাহলে?

আমার মন বলছে তাই বললাম। আমার মন আরও বলছে যে ডাক্তার তরফদার আমাকে তোমার বাসায় নিয়ে যেতে দেখলেও কিছু বলবেন না।

আ..আ....মি...

পরী এবার মাথা উচু করে সরাসরি ইমরানের চোখে তাকাল। তারপর ঢুলু ঢুলু চোখে বলল, আমার সত্যি ভালো লাগছে না, তুমি আমাকে বাসায় নিয়ে চলো। তা না হলে আমি পড়ে যাব।

ঠিক আছে, চলো যাই।

ইমরানের ইচ্ছে ছিল বাসে করে যাওয়ার। কিন্তু পরীর যে অবস্থা তাতে বাসে যাওয়া যাবে না। বাসের ভীড় আর বিড়ি সিগারেটের গন্ধে পরী আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। তার উপর সময়ও লাগবে বেশি। শেষে সে একটা সিএনজি নিল। খরচ প্রায় পাঁচগুন লাগল। এতগুলো টাকা খরচ করতে সত্যি কষ্ট হলো ইমরানের। কারণ তার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। নতুন মাসের বেতন না পাওয়া পর্যন্ত দুরবস্থা কাটবে না। এই কয়েকটা দিন যেভাবেই হোক কষ্ট করে কাটিয়ে দিতে হবে।

পরীকে নিয়ে ইমরান যখন ডাক্তার তরফদারের বাসায় এলো তখন রাত সাড়ে দশটা বাজে। ভাগ্যক্রমে বাইরের গেট খোলা পেল। এই গেটটা অবশ্য প্রায়ই খোলা থাকে। পাগলের ডাক্তারের বাড়ি বলে বোধহয় চোর ডাকাত আসে না। বাড়ির একমাত্র দারোয়ান বয়োবৃদ্ধ করিম চাচা রাত বারোটার পর বাইরের গেটে তালা লাগায়। এই বাড়িতে তারা ছাড়া এখন আর দুজন মানুষ আছে। একজন ডাক্তার তরফদার, সারাদিন বসে বসে বই পড়েন। আর দ্বিতীয়জন দারোয়ান করিম চাচা। বয়স পঞ্চাশের উপরে হবে, দিনের অধিকাংশ সময় বিছানায় শুয়ে কাটায়। মাঝে মধ্যে বাড়ির চারপাশে চক্কর দেয় আর বিড় বিড় করে কী সব বলে। দেখে মনে হয় মানুষটা স্বাভাবিক না, তার মধ্যে ভয়ংকর অস্বাভাবিকতা আছে। আর এ জন্য ইমরান, করিম চাচাকে কিছুটা হলেও ভয় করে। তবে এখন পর্যন্ত ভয়ের কোনোকিছু সে ঘটায়নি।

৫

দোতলায় উঠে ইমরান পরীকে খাটের উপর বসতে বলল। পরী খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঠিকমতো বসে থাকতে পারছে না। মাথাটা নিজে থেকেই ঢলে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত আর না পেরে সত্যি সে শুয়ে পড়ল।

ইমরান বুঝতে পারল পরীর এখন যা দরকার তা হলো খাবার আর পরিচর্যা। সে পরীর দিকে খানিকটা ঝুকে এসে বলল, পরী, আমি বুঝতে পারছি তোমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি সামনের মোড় থেকে খাবার নিয়ে আসছি।

পরী টেনে টেনে বলল, না তুমি যাবে না, আমাকে একা রেখে কোথাও যাবে না।

রাতে খাবে না?

আমার ক্ষুধা নেই।

ইমরান বুঝতে পারল পরী একা থাকতে ভয় পাচ্ছে। বলল, ঠিক আছে দেখি ঘরে কি আছে। ঘরে কিছু খাবার রেখে গিয়েছিলাম, সেগুলো থাকলে খাবার ব্যবস্থা করছি।

এবার পরী আর নিষেধ করল না।

ইমরান রান্না ঘরে এলো। ঘরে আসলে তেমন কিছু নেই। টিনের জারের মধ্যে সামান্য কিছু চাল পেল। ফ্রিজে পেল একটা ডিম। টোপলার মধ্যে পেল কিছু মশুরীর ডাল। দুটো চুলোতে ভাত আর ডাল তুলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে পরী রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ইমরান অবাক হয়ে বলল, তুমি উঠে এলে কীভাবে! তোমার শরীর খুব দুর্বল।

পরী টেনে টেনে বলল, পানি খাব।

আমাকে ডাকলেই পারতে?

তোমাকে কি বলে ডাকব?

প্রশ্নটা শুনে থতমত খেয়ে গেল ইমরান। সত্যিই তো, পরী তাকে কী বলে ডাকবে? সে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না, দেখল পরী উত্তরের অপেক্ষায় একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কী সুন্দর দৃষ্টি! দেখলে একেবারে মন ভরে যায়। ইমরান যেন এরকম সুন্দর দৃষ্টির কাউকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল।

পরী পুরো এক গ্লাস পানি খেল। তারপর ধীর পায়ে এসে বসল খাটের উপর। কিন্তু সে বসে থাকতে পারল না। আগের মতো শুয়ে পড়ল। ইমরান অনুভব করল পরীর সাথে তার কিছুক্ষণ কথা বলা উচিত। তাহলে পরী জড়তা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। এরকম চিন্তা থেকে সে বলল, পরী, আসলে তোমার কপাল খারাপ। তুমি যাকে বিয়ে করেছ সে একজন খুব সাধারণ মানুষ।

পরী বিড় বিড় করে বলল, তুমি খুব ভালো।

আমি ভালো কিনা জানি না। তবে আমি সবকিছু গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করছি। আসলে ঘরের মধ্যে জিনিসপত্রও কিছু নেই।

সবই তো আছে তোমার ঘরে। ফ্রিজ, টেলিভিশনও দেখছি।

ফ্রিজ, টেলিভিশন আমার না।

কার?

ফ্রিজ টেলিভিশন দোকানের যে ম্যানেজার এখানে ছিল সেই হাশমত ভাইয়ের।

এগুলো নিয়ে যায়নি কেন?

সময় পায়নি। ডাক্তার তরফদার মুহূর্তের মধ্যে হাশমত ভাইকে বের করে দিয়েছিলেন। এগুলো নেয়ার মতো অবস্থা হাশমত ভাইয়ের ছিল না। এরপর ভয়ে আর আসেনি। আমার সাথে মোবাইল ফোনে একবার কথা হয়েছিল, বলেছে এখানে রেখে দিতে। পরে নিয়ে যাবে।

ও আচ্ছা।

তুমি একটু শুয়ে থাকো। আমি খাবার নিয়ে আসি।

আচ্ছা।

ভয় পেও না। ভয় পেলে আমাকে ডাক দিও।

কথাটা বলে ইমরান নিজেই থমকে গেল। আবার যদি পরী জিজ্ঞেস করে তাকে কি বলে ডাকবে তাহলে সে উত্তর দিতে পারবে না। তবে ভাগ্য ভালো পরী প্রশ্নটা করল না।

খাবার খেতে বসে ইমরান বলল, পরী ঘরে আসলে কিছু ছিল না, খুব সাধারণ খাবার। ডিম, ডাল, ভাত। জীবনে প্রথম তোমাকে আমি খাওয়াচ্ছি। অথচ খাবার এত সাধারণ যে নিজেরই লজ্জা লাগছে। মনে কষ্ট নিও না।

পরী দু'হাতে ভর দিয়ে অনেক কষ্টে উঠে বসল।

ইমরান একটা প্লেট পরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে আর একটা প্লেট নিজের জন্য নিল। তারপর পরীর প্লেটে পানি ঢেলে দিয়ে বলল, নাও, হাত ধূয়ে নাও।

পরী পানিতে হাত ধূলে ইমরান নিজেও প্লেটে নিজের হাত ধূলো। তারপর প্লেটের পানি ফেলার জন্য রান্নাঘরে গেল। ফিরে এসে দেখে পরী মাথা নিচু করে বসে আছে। প্লেটটা সামনে এগিয়ে দিয়ে ইমরান হাসিমুখে বলল, কী ভাবছ পরী?

পরী কোনো কথা বলল না। আগের মতোই মাথা নিচু করে বসে থাকল।

ইমরান পরীর প্লেটে ভাত তুলে দিল। তারপর ডিমের অর্ধেকটা তুলে দিয়ে বলল, নাও, খাওয়া শুরু কর।

কথাটা বলে থমকে গেল ইমরান। সে দেখল পরী কাঁদছে, পরীর চোখের পানি প্লেটের উপর এসে পড়ছে। সে অবাক হয়ে বলল, পরী তুমি কাঁদছ? কেন?

পরী কোনো কথা বলল না, শুধু চোখ তুলে উপরের দিকে তাকাল।

ইমরান সত্যি খুব মর্মাহহত হলো। সে ভাবল খাবার দেখে বুঝি পরী কষ্ট পেয়েছে। বলল, পরী, আমি আগামীকাল সকালে ভালো বাজার করব। তখন ভালো খেতে পারবে। এখন একটু কষ্ট করে খাও। ক্ষুধা পেটে ডিমভাজি, ডাল, ভাত খারাপ লাগবে না।

এবার পরীর চোখ দুটো দ্রুত কেঁপে উঠল।

ইমরান চমকে উঠে বলল, কী হয়েছে পরী? তোমার চোখ কাঁপছে কেন?

পরী কোনো কথা বলল না। তার চোখ দুটো ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করল। একই সাথে ঠোঁটও কাঁপতে লাগল।

ইমরান দ্রুত পরীর দিকে এগিয়ে গেল। মুখে বলতে থাকল, কী হয়েছে পরী? কী হয়েছে?

পরীর মুখটা এখন বিশ্রীভাবে বেঁকে যেতে শুরু করেছে। একইসাথে কাঁপতে শুরু করেছে পা।

ইমরান ভয় পেয়ে গেল। এ সে কোন পরীকে দেখছে? ঠিক দুদিন আগে তাদের বাসর রাতে পরী এরকম আচরণ করেছিল। এ পরী যেন ধীরে ধীরে অন্য পরী হয়ে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে কেমন যেন শব্দ করছে। মনে হচ্ছে পরী কিছু বলতে চাচ্ছে কিন্তু বলতে পারছে না। কেউ বুঝি তার গলাটা চেপে ধরেছে।

এক পর্যায়ে পরী আর বসে থাকতে পারল না। ধপ্ করে মেঝেতে পড়ে গেল। পড়ার সাথে সাথে পরীর হাত পা ভয়ংকর দ্রুততার সাথে কাঁপতে শুরু করল। পায়ের ধাক্কায় প্লেটের ভাত নিচে পড়ে গেল, উল্টে গেল ডালের পাতিলটা। পানির জগটা গড়িয়ে রুমের কোনা পর্যন্ত চলে গেল।

পরীর শরীরটা অদ্ভুতভাবে বেঁকে গেছে। সাধারণত এরকমভাবে মানুষের শরীর বাঁকা সম্ভব না। অথচ পরীর ক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে। কীভাবে সম্ভব হচ্ছে বুঝতে পারছে না ইমরান। তবে সে অনুমান করছে সবকিছু জ্বীনের কাজ। তা না হলে পরীর শরীর কখনও এভাবে কাঁপতে পারে না। শরীর এতটা জোরে কাঁপছে সে শরীরের কাপড় পর্যন্ত এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

পরীর কষ্ট দেখে ইমরানের চোখে পানি চলে এলো। কী করবে সে কিছু বুঝতে পারছে না। দু'বার পরীকে সে চেপে ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। পরী ঝটকা দিয়ে ছুটে গেল। পরীর শরীরে এত শক্তি কোথা থেকে এলো সেটাও বুঝতে পারল না সে। শেষে নিজে ধপ্ করে মেঝের উপর বসে পড়ল।

প্রায় তিন মিনিট পর নিস্তেজ হয়ে এলো পরীর শরীর। ইমরানের মনে হয়েছে এই তিন মিনিট পরী ভয়ংকর কোনো অপশক্তির সাথে যুদ্ধ করেছে। ঘামে পরীর সমস্ত শরীর ভিজে গেছে। এখন শুধু লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছে। কিন্তু ঠিক মতো শ্বাস নিতে পারছে না। মুখে ফেনা জমে আছে। হা যে করবে সেই শক্তিও যেন নেই।

ইমরান একটা সাদা কাপড় এনে পরীর মুখটা মুছে দিল। তারপর চায়ের চামচে পরীর মুখে পানি দিলে পরী ধীরে ধীরে তিন চামচ পানি খেল।

পানি খাওয়ান শেষ হলে ইমরান পরীকে খাটের উপর শুইয়ে দিল। পরীর চোখদুটো এখন একেবারে রক্তশূন্য হয়ে আছে, চোখের পাতাও স্থির হয়ে গেছে। শুধু মনিটা হালকা নড়ছে। পরীর কতগুলো চুল মুখের উপর এসে পড়ায় সেগুলো ইমরান হাত দিয়ে সরিয়ে দিল। চুল সরানোর সময় তার হাতটা পরীর কপালে লাগতে চমকে উঠল সে। পরীর জ্বর আসতে শুরু করেছে। এই জ্বরটাকে কেন যেন ভালো মনে হচ্ছে না তার। ঘরে প্যারাসিটামল নেই যে পরীকে খাওয়াবে। অবশ্য থাকলেও কোনো লাভ হতো না, কারণ পরীর প্যারাসিটামল খাওয়ার মতো অবস্থা নেই। পরী একেবারে আধমরার মতো পড়ে আছে।

মেঝের থালা-বাটিগুলো গুছিয়ে ইমরান আবার পরীর কাছে এলো। পরীর জ্বর এখন আরও বেড়েছে। কত জ্বর অনুমান করতে চেষ্টা করলে সে। কিন্তু পারল না। একটা থার্মোমিটারের অভাব সে এখন খুব অনুভব করছে। ঠিক করল আগামীকাল সে একটা থার্মোমিটার কিনবে। আসলে অনেক কিছুই কেনা দরকার, কিন্তু অধিকাংশ জিনিসই তার কেনার সামর্থের বাইরে।

একটা ভেজা গামছা দিয়ে ইমরান পরীর কপালে জ্বলপট্টি দিতে লাগল। অনেকক্ষণ জ্বলপট্টি দেয়ার পরও যখন জ্বর কমল না তখন সত্যি চিন্তিত হয়ে পড়ল ইমরান। পানিতে কোথায় পরীর কপাল ঠান্ডা হবে, উল্টো পরীর কপালের উত্তাপে ভেজা গামছা গরম হয়ে উঠছে। ইমরান বুঝল, এটা কোনো শুভ লক্ষণ না।

পরীর জ্ঞান আছে কি নেই তাও ইমরান বুঝতে পারছে না। শেষে থাকতে না পেরে ডেকে উঠল, পরী, পরী?

পরী কোনো কথা বলল না। শুধু তার চোখের মনি দুটো নড়ছে।

আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

পরীর কোনো উত্তর নেই।

ইমরান বুঝল যেভাবেই হোক পরীকে ডাক্তার দেখাতে হবে। কিন্তু এত রাতে সে ডাক্তার পাবে কোথায়? রাত পৌনে বারোটা বাজে। পরীকে হাসপাতালে নেয়া যায়। কিন্তু হাসপাতাল অনেক দূরে। তাছাড়া এত রাতে হাসপাতালেও ডাক্তার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে তার। আশেপাশে কোনো ক্লিনিকও নেই যেখানে পরীকে সে নিয়ে যেতে পারে।

অবশেষে ইমরান ভয়ংকর সিদ্ধান্তটা নিল। আর তা হলো নিচ তলার ডাক্তার তরফদারের কাছে যাবে। এতে যা হবার হবে। ডাক্তার তরফদার তাকে বকা ঝকা যাই করুক, পরীকে না দেখে পারবে না। কারণ সে একজন ডাক্তার। ডাক্তাররা কখনো রুগীকে না দেখে থাকতে পারে না।

৬

ডাক্তার তরফদারের দরজার সামনে এসে ভয়ে ইমরানের বুক শুকিয়ে গেল। তার কেন যেন মনে হতে লাগল ডাক্তার তরফদার তাকে আর পরীকে আজ রাতেই বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। পরী যে অসুস্থ সেটা তিনি আমলেই নেবেন না। পারলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন। কপাল খুব খারাপ হলে পুলিশেও দিতে পারেন।

ডাক্তার তরফদার জেগেই ছিলেন। কলিংবেলের শব্দ পেয়ে নিজে দরজা খুললেন। চশমার ফাঁক দিয়ে ইমরানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বললেন, নতুন বিয়ে করেছ, তাই না?

ইমরান এ ধরনের প্রশ্নের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তার মনে হতে লাগল সে এখনই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। অনেক কষ্টে ভারসাম্য রক্ষা করে তোতলাতে তোতলাতে বলল, জ্বি..জ্বি... স্যার। আ..আপনি জানলেন কী..কীভাবে?

করিম বলল তুমি বোরকা পরা একটা মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছ। মেয়েটা বাড়িতে ঢোকার সময় তোমার হাত ধরেছিল। স্ত্রী বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। রাস্তার মেয়ে হলে তোমার হাত ধরত না, তোমার মানিব্যাগ ধরত। বুঝতে পেরেছ?

জ্বি স্যার।

তো এত রাতে বৌকে ফেলে এখানে কেন? নিশ্চয় কোনো অঘটন ঘটিয়েছ?

জ্বি স্যার।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম এরকম ঘটে। মুখে পানির ছিটা দাও দেখবে ঠিক হয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই।

স্যার মনে হয় অন্যকিছু। আ..আসলে...

আসলে কি?

ইমরানের মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, স্যার যদি একটু আসতেন, পরীকে একটু দেখতেন।

পরী তোমার স্ত্রী।

জ্বি স্যার। যদি একবার দেখতেন?

দেখতে হবে কেন?

ওকে জ্বীনে ধরেছে।

ডাক্তার তরফদার সরু চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, তুমি দেখি বাড়িতে সব জ্বীন পরী নিয়ে এসেছ। এসব কি? অবশ্য তোমার কী দোষ? বাড়ি ভাড়া দেয়ার সময় করিম তো তোমাকে বলেনি যে তুমি জ্বীন পরী নিয়ে এই বাড়িতে আসতে পারবে না। শুধু বলেছিল যে তুমি মেয়েমানুষ, এমন কি তোমার স্ত্রীকে নিয়েও এই বাড়িতে আসতে পারবে না। তুমি নিয়ম ভঙ্গ করেছ, করো নি?

ইমরান এবার কাঁদো কাঁদোভাবে বলল, হ্যাঁ স্যার করেছি। আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না।

ডাক্তার তরফদার বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, এখন সব ঝামেলা আমার উপর চাপাচ্ছ, কেন?

স্যার আপনি যা বলবেন বলেন, এখন একবার চলুন, আপনি না গেলে পরীকে বাঁচানো যাবে না, ওর অবস্থা সত্যি খারাপ।

ডাক্তার তরফদার কয়েক মুহূর্ত ইমরানের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে চলো।

পরীকে দেখে ডাক্তার তরফদার থমকে গেলেন। পরীর হাতের উপরের কালো দাগগুলোর উপর চোখ পড়তে বললেন, এই দাগের কারণ যদি তুমি হও নিশ্চিত থাকতে পারো আমি তোমাকে পুলিশে দেব ।

সুযোগ পেয়ে ইমরান তাড়াতাড়ি বলল, স্যার আমি এইগুলোর জন্য দায়ী নই। জ্বীন তাড়ানোর জন্য জব্বার ফকির করছে।

ডাক্তার তরফদার চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, ঐ জব্বার ফকিরকে যদি তুমি ডেকে এনে থাকো তাহলে নির্ঘাত তোমার সাত বছর জেল খাটার ব্যবস্থা করব।

না স্যার আমি করি নি। পরীর বাবাই ডেকে এনেছিল। আমি উল্টো সাথে করে পরীকে নিয়ে এসেছি।

ওকে আনার পর এখন আমাকে ডেকে এনেছ যেন আমি জ্বীন তাড়ানোর ব্যবস্থা করি, না?

না স্যার। আপনি যদি দয়া করে সবকিছু শুনতেন।

তোমার কথা পরে শুনব, আগে দেখি ওকে বাঁচাতে পারি কিনা। মানুষের শরীর থেকে জ্বীন ছাড়ানো সবচেয়ে কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটা আমাকে করতে হবে।

কথাগুলো বলে ডাক্তার তরফদার একটা কাগজে স্যালাইনের প্রেসক্রিপশন করে করিম চাচাকে স্যালাইন নিয়ে আসতে বললেন। পরীর হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ পরীক্ষা করতে করতে বললেন, এত সুন্দর মেয়েটাকে তুমি তো প্রায় মেরে ফেলেছ! যদি সত্যি ওর কিছু হয় তাহলে নিশ্চিত থাকতে পারো তোমার বিরুদ্ধে আমি নিজে মার্ডার কেস করব।

স্যার...স্যার..

স্যার স্যার করো না, আমাকে আগে খবর দাওনি কেন?

ভয়ে দেইনি স্যার। আসলে বুঝতে পারিনি পরী এত অসুস্থ।

ডাক্তার তরফদার ধমকে উঠে বললেন, তা বুঝবে কেন? যাও জলপট্টির ব্যবস্থা করো।

স্যার আমি জলপট্টি দিয়েছি...

ডাক্তার তরফদার বড় চোখ করে বললেন, সারা রাত ধরে দেবে, প্রয়োজনে সারা জীবন ধরে দেবে।

জ্বি স্যার, জ্বি স্যার।

কথাগুলো বলে ইমরান তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে চলে গেল। পানি গরম করে জলপট্টি দিতে শুরু করলে করিম চাচা স্যালাইন নিয়ে এলো। সাথে কতগুলো ওষুধ। ওষুধগুলো স্যালাইনের মধ্যে দিয়ে পরীর ডান হাতে স্যালাইন পুশ করে দিলেন ডাক্তার তরফদার। তারপর বললেন, এই স্যালাইন শেষ রাত পর্যন্ত চলবে। তার আগে ঘুমাবে না।

জ্বি স্যার।

যদি ঘুমিয়ে পড়ো তাহলে স্যালাইনের টিউবে রক্ত উঠে আসবে। তখন আরও বিপদ হবে। স্যালাইন শেষ হলে সুইটাকে টান দিয়ে খুলে ফেলবে। পারবে?

জ্বি স্যার পারব।

না পারলে আমাকে ডাকবে।

জ্বি স্যার।

পরী এখনও জেগে আছে। তবে সে খুব দুর্বল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে। পরীর ঘুম খুব প্রয়োজন। ওকে ঘুমাতে দিবে। বিরক্ত করবে না।

জ্বি স্যার।

ডাক্তার তরফদার এবার চেয়ারের পিছনে হেলান দিলেন। তারপর বললেন, এখন বলো পরীর ঘটনা বলো। সবকিছু বিস্তারিত বলবে। কোনোকিছু বাদ রাখবে না। আমি সব শোনার পর সিদ্ধান্ত নেব অ্যাম্বুলেন্স ডেক পরীকে হাসপাতালে পাঠাব, নাকি এখানেই চিকিৎসা করব।

ইমরান চোখ বড় বড় করে বলল, পরীকে হাসপাতালে নিতে হবে!

যে অবস্থা হাসপাতালে নিলেই ভালো হতো। তবে এ যাত্রায় বড় ঝুকি নেই, বেঁচে যাবে। অবশ্য রাতটা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি জ্বর আরও বাড়ে তাহলে হাসপাতালে নিতেই হবে। এখন জ্বর একশ তিন, যদি একশ পাঁচ হয় সেক্ষেত্রে আর বাসায় রাখা যাবে না। আমি থার্মোমিটার রেখে যাব, তুমি প্রতি আধ ঘণ্টা পর পর জ্বর মেপে পরীক্ষা করে দেখবে। এখন বলো, পরীর সম্পর্কে যা জানো সবকিছু বলো।

ইমরান প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে সবকিছু সে খুলে বলল। ডাক্তার তরফদার খুব মনোযোগের সাথে কথাগুলো শুনলেন। সব শোনা শেষ হলে তিনি এক মিনিট চোখ বন্ধ করে থাকলেন। তারপর প্রশ্ন করে বললেন, তুমি কি মনে করো পরী তোমাকে খুব অপছন্দ করে?

ইমরান অপরাধীর ভঙ্গিতে বললেন, জ্বি স্যার।

কেন এরকম মনে করো?

আমাকে দেখলেই ও ঐরকম ভয়ংকর আচরণ করে।

তুমি কি মনে করো পরী ইচ্ছে করে ঐরকম আচরণ করছে?

না স্যার?

কেন মনে করো না?

পরীর হাত পা, শরীর এমনভাবে বেঁকে যায় যে সাধারণ কোনো মানুষের পক্ষে ওভাবে শরীর কিংবা কোনো অঙ্গ-প্রতঙ্গ বাঁকানো সম্ভব না। একমাত্র ভূত-প্রেত, জ্বীন- পিশাচ...

ডাক্তার তরফদার ইমরানকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন, তুমি এগুলোতে বিশ্বাস করো?

জানি না স্যার।

কখনো ভূত-প্রেত, জ্বীন- পিশাচ দেখেছ?

না স্যার দেখিনি।

তাহলে আপাতত এটুকু বিশ্বাস করতে পার, তোমার স্ত্রী পরীকে ভূত-প্রেত, জ্বীন-পিশাচ কিছুতে ধরেনি। মূল বিষয়টা হচ্ছে পরী অসুস্থ, পরীকে আমাদের সুস্থ করে তুলতে হবে। এজন্য যা যা করার সবকিছু করতে হবে। পারবে না?

জ্বি স্যার পারব।

যদি পরী রাজি হয় তাহলে আগামীকাল পরীর কয়েকটা টেস্ট করবে। আমি এগুলো লিখে দিয়ে যাচ্ছি। রিপোর্টগুলো হাতে পেলে আমার কাছে নিয়ে আসবে। এখন আমি চলে যাচ্ছি। মনে করে স্যালাইনের সূচটা খুলে দিও। তা না হলে বড় ধরনের সমস্যা হবে।

ঠিক আছে স্যার।

ডাক্তার তরফদার উঠে পড়লেন। দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর পিছন ফিরে বললেন, তুমি একটা ব্যাপার বিশ্বাস করতে পারো, আর তা হলো পরী তোমাকে অপছন্দ করে না, বরং পছন্দ করে। যদি অপছন্দ করত তাহলে গ্রাম থেকে এতদূরে তোমার সাথে আসত না।

কথাগুলো বলে ডাক্তার তরফদার চলে গেলেন। আর ইমরান ফিরে এলো পরীর পাশে। পরী এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পরীকে এখন কেন যেন তার আরও বেশি সুন্দর লাগছে। এত সুন্দর পরী তার; সেই পরী তাকে পছন্দ করে, ভালোবাসে, ভাবতেই নিজের মধ্যে ভিন্ন একরকম প্রশান্তি অনুভব করল ইমরান।

৭

ইমরানের ঘুম ভাঙল নরম হাতের মৃদু স্পর্শে। চোখ মেলে দেখে চায়ের কাপ হাতে পরী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ইমরানের মনে হলো সে স্বপ্ন দেখছে। মাথাটা ঝাকি দিয়ে দ্রুত উঠে বসল সে। তারপর চোখ ডলে বলল, তুমি?

হ্যাঁ, এই নাও চা।

ইমরান ঘড়ি দেখল। সাড়ে আটটা বাজে। রাতে ডাক্তার তরফদার চলে যাওয়ার পর থেকে পরীর জ্বর কমতে থাকে। শেষ রাতে সে যখন স্যালাইন খুলে ফেলে তখন পরীর শরীরে একটুও জ্বর ছিল না। তাই বলে পরী সকালে উঠে তাকে চা বানিয়ে খাওয়াবে এটা তার কাছ কোনোভাবেই কাম্য ছিল না। তাই অবাক হয়ে বলল, চা বানালে কখন?

আমি উঠেছি বেশ আগে। তুমি ঘুমাচ্ছিলে তাই ডাকিনি। ভেবেছিলাম তোমার জন্য সকালের নাস্তা বানাব। কিন্তু ঘরে কিছু নেই, শুধু চা আর চিনি পেলাম। তাই লাল চা বানালাম।

তুমি আমাকে ডাকলে না কেন?

ডাকনি এই কারণে যে তুমি অনেক রাতে ঘুমিয়েছ। সম্ভবত ডাক্তারও নিয়ে এসেছিলে। কারণ স্যালাইন দেখলাম।

ইমরান চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, ডাক্তার তরফদার এসেছিলেন। তাকে ডেকেছিলাম।

ভালো করেছ, কাল হঠাৎ সত্যি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কি যে হলো?

ইমরানের বলতে ইচ্ছে হলো তুমি দুদিন আগেও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে। কিন্তু সে বলতে পারল না। ঐ বিষয়টা নিয়ে তার এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বরং বলল, তোমার আজ নাস্তা বানান দরকার নেই। আমি হাতমুখ ধূয়ে মোড়ের হোটেল থেকে নাস্তা নিয়ে আসছি।

ঠিক আছে যাও, আর দুধ এনো। আমার দুধ চা খেতে খুব পছন্দ।

আনব।

ঘরে কোনো বাজার নেই, বাজারও দরকার।

তুমি একটা লিস্ট করো। নাস্তা নিয়ে এসে তারপর বাজারে যাব।

আচ্ছা।

ইমরান নিচে মেঝেতে শুয়ে ছিল। সে চায়ের কাপ হাতে খাটের উপর উঠে বসলে পরী মেঝে থেকে বালিশটা উপরে তুলে রাখল। তারপর জানালার পাশে গিয়ে বলল, এই বাড়িটা পুরাতন হলে সুন্দর। চারপাশে অনেক খোলামেলা জায়গা। অনেক বড় বড় গাছ। একটা চালতা গাছও আছে দেখছি।

চালতা গাছটার বয়স অনেক বেশি।

আমাদের বাড়িতেও একটা চালতা গাছ আছে। ওটার বয়সও অনেক।

এই বাড়িতে অনেক বছর বয়সী বেশ কতগুলো গাছ আছে।

বড় বাড়িতে পুরাতন গাছ থাকে, এটা তার প্রমাণ।

হ্যাঁ ঠিক ধরেছ। বাড়িটা প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর। ঢাকা শহরে এরকম বাড়ি আর দ্বিতীয়টা আছে বলে আমার জানা নেই। বাড়িটা ডাক্তার তরফদারের দাদার আমলের বাড়ি।

এত বড় বাড়ির যে মালিক, তার মনটা নিশ্চয় বড়।

আগে আমি ডাক্তার তরফদারকে অন্যরকম ভাবতাম। কিন্তু গতরাতের পর থেকে তার প্রতি ধারণা পাল্টেছে। আসলেই তার মন বড়। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো, বাড়িটাকে সবাই বলে পাগলের বাড়ি।

উনি পাগলের ডাক্তার এজন্য বলে।

হ্যাঁ।

তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি আর কতদিন এই বাড়িতে থাকতে পারবে?

পরশুদিন এক তারিখ। বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আর দুইদিন মাত্র থাকতে পারব।

একটু থেমে ইমরান আবার বলল, আমি জানি বাড়িটা ছেড়ে যেতে তোমার খুব কষ্ট হবে, কিন্তু উপায় নেই। আমি আজ কালকের মধ্যেই একটা ভালো বাসা খুঁজে বের করব।

পরী ঘুরে বলল, আমরা আর কিছুদিন এখানে থাকতে পারি না?

কীভাবে থাকবে? ডাক্তার তরফদারের অনেক বই। নিচ তলায় কখনও গেলে বুঝতে পারবে। আরও নাকি বই আছে, সেগুলো এখনও আনেননি। এই বইগুলো উনি দোতলায় রাখবেন। তাতেও নাকি জায়গা হবে না।

উনি নিশ্চয় বুঝবেন বইয়ের থেকে মানুষ অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

ইমরান কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে বলল, তুমি কি বলতে চাচ্ছ?

বলতে চাচ্ছিলাম, উনি হয়তো আমাদের আরও কয়েকদিন এখানে থাকতে দিতে পারেন।

ইমরান অবাক হয়ে বলল, কেন দিবেন?

জানি না, মন বলছে তাই বললাম। বাদ দাও ওসব কথা। ঘরটা এলোমেলো হয়ে আছে। গতরাতে কী বিশ্রী আচরণই না আমি তোমার সাথে করেছি। এখন আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। তুমি চিন্তা করো না, ঘর গুছাতে আমার সময় লাগবে না।

কথাগুলো বলে পরী রান্নাঘরে চলে গেল। পরীর চলে যাওয়া দেখে ইমরান অবাক না হয়ে পারল না। একেবারে অভ্যস্ত গৃহীনীর মতো মনে হলো পরীকে। সকাল থেকে পরী তার সাথে যেভাবে কথা বলছে তাতেও বিস্মিত হচ্ছে সে। কে বলবে গত রাতে কী ভয়ানক অবস্থা ছিল পরীর? সকালের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে পরী যেন বহুদিন ধরে তার স্ত্রী এবং সম্পূর্ণ সুস্থ। অথচ তাদের বিয়ে হয়েছে চারদিনও পার হয়নি। যাইহোক, পরীর এই স্বাভাবিক আচরণ খুব ভালো লাগছে তার। নিজের ঘরের মধ্যে পরীর মতো সুন্দরী আর ভালো একজন স্ত্রী আছে, এরকম ভাবনা তার এখন অন্যতম প্রশান্তির কারণ। সত্যি সে বড় সৌভাগ্যবান। কিন্তু মনের গভীরে কোথায় যেন একটা ভয় কাজ করছে। ভয়টা এজন্য যে হঠাৎ আবার পরী অসুস্থ হয়ে না পড়ে!

ইমরান রাস্তার মোড় থেকে গরম রুটি, ডাল আর ডিম কিনল। ফিরে আসার সময় তার ফোন বেজে উঠল। ডিসপ্লে স্ক্রিণ দেখে বুঝতে পারল তার বাবা ফোন করেছে। কিন্তু ফোন ধরতে গলা শুনল তার মা রত্না বেগমের। প্রথমেই প্রশ্ন করে বলল, ইমরান, তুই কোথায়?

ঢাকায় মা।

এসব আমি কি শুনতেছি?

কি শুনছ?

তুই নাকি ঐ জ্বীনে ধরা বউরে নিয়া ঢাকায় গেছস?

হ্যাঁ মা।

কেন?

চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসা না করলে পরীর অসুস্থতা আরও বাড়বে। পরীর চিকিৎসার প্রয়োজন।

রত্না বেগম খানিকটা গলা চড়িয়ে বলল, আমার তো মনে হয় ঐ জ্বীন তোর উপরও চাইপা বইছে। ঢাকায় জ্বীনের চিকিৎসা করাবি ক্যামনে? ঢাকায় কি জ্বীনের ওঝা আছে নাকি?

মা, আমি ওকে ভালো ডাক্তার দেখাব।

তোর ডাক্তার দেখান লাগবে না। ওরে ওর বাড়িতে দিয়া আয়, নইলে রাস্তায় নিয়া ছাইড়া দে।

ইমরান বিস্মিত কণ্ঠে বলল, এসব কি বলছ মা!

যা বললাম তাই কর্।

ও তোমাদের বাড়ির বউ।

বউ না ছাই! জ্বীনে ধরা একটা পাগল। ঐ নিরু মেম্বার কী বেঈমানীটাই না করল, তোর মতো ছেলের ঘাড়ে কিনা একটা জ্বীনে ধরা মাইয়া তুইলা দিল। একবার ভাবলও না। আর তোর বাপও ঐরকম, যে যা বুঝায় তাই বুঝে। শোন্, তুই ঐ বউরে আইজই বাড়ি থাইকা বাইর কইরা দিবি। তারপর আমারে ফোন করবি।

মা, তুমি এসব কি বলছ। তোমরাই তো পরীর সাথে আমার বিয়ে দিলে। তাছাড়া পরী ভালো মেয়ে।

ভালো না ছাই। আমি কিছু শুনবার চাই না। গ্রামের সব মানুষ বলতেছে তুই নাকি পাগল বিয়া করছস, জ্বীন বিয়া করছস্। এই কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না। তুই ওরে তালাক দিবি।

ইমরান খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, মা তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

মাথা আমার ঠিকই আছে। মাথা খারাপ হইছে তোর। তুই একটা জ্বীনে ধরা মাইয়ারে নিয়া সংসার করতেছিস। আমি তোরে বইলা দিলাম, ঐ মাইয়ার মুখ আমি দেখবার চাই না।

মা...

লাইন কেটে দিল রত্না বেগম। ইমরান কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। তার মনটা এখন খুবই খারাপ হয়ে আছে।

বাসায় ফিরে ইমরান আর পরী একসাথে নাস্তা করল। ইমরান লক্ষ্য করল পরী কাজে কর্মে খুব পটু। সবকিছু সে এত দ্রুততা আর দক্ষতার সাথে করে যে তার নিজেরই দেখতে ভালো লাগে। অথচ পরীকে সবাই এখন বলছে জ্বীনে ধরেছে, পরী পাগল। ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে।

নাস্তা শেষে ইমরান আবার বের হলো। বাজার করতে হবে। ঘরে কিছু নেই। পরী তার হাতে বাজারের যে ফর্দটা ধরিয়ে দিল তা খুব সাধারন। মাছ, মাংস কিছুরই উল্লেখ নেই। শুধু ডিম, সবজি আর কিছু প্রয়োজনীয় মসলার কথা লেখা। সাথে অবশ্য দুধ উল্লেখ আছে। ইমরান অনুমান করল পরী তার দৈন্য দশার অবস্থা উপলব্দি করেছে। এটা বুঝতে পেরে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। নতুন বউকে সে ভালোমন্দ কিছু খাওয়াতে পারছে না - এটা আসলেই অনেক কষ্টের।

ইমরানের কাছে যে টাকা একেবারে নেই তা নয়। তবে সে শঙ্কিত পরীর চিকিৎসার জন্য কত টাকা লাগবে ভেবে। অন্য মাস হলে বাড়ি ভাড়া অফিস থেকে বেতন পাওয়ার পর দিতে পারত। কিন্তু এ মাসে সেটা সম্ভব হবে না। এক তারিখে তার বাসা ছাড়তে হবে এবং তার আগেই ভাড়া

দিতে হবে, তা না হলে ডাক্তার তরফদার হয়তো ভাববেন সে আর ভাড়া দেবে না। কাজেই বেতন পাওয়ার আগেই হাত একেবারে খালি হয়ে যাবে। তাছাড়া পরীকে ভালো একজন ডাক্তার যে দেখান দরকার সেটাও বুঝতে পারছে ইমরান। কিন্তু কোন ডাক্তারের কাছে যাবে সেটা বুঝতে পারছে না। ঢাকা শহরে ডাক্তারের অভাব নেই, শহরের অলি গলি সবজায়গায় ডাক্তার আছে। কিন্তু সঠিক ডাক্তার খুঁজে বের করা কঠিন। আরও একটা বড় খরচ আছে। পরীকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দিতে হবে। সে অফিসে গেলে পরী একা একা থাকবে। মোবাইল ফোন থাকলে জরুরী পরিস্থিতিতে পরী তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। এটা অনেক বড় একটা সুবিধা। মোবাইল ফোন তাকে কিনতেই হবে। তা না হলে অফিসে সে শন্তিতে থাকতে পারবে না।

ইমরান বাজার থেকে মাছ, মাংস দুটোই কিনল। তার কেনার ইচ্ছে ছিল না। ডিম আর টুকটাক বাজার শেষ করে এসেছিল মুদি দোকানে। এই দোকানটা থেকে সে দীর্ঘদিন কেনাকাটা করে। দোকানদারকে সে ভালোমতো চেনে। দোকানদারকে যখন বলল, ভাই মুদির জিনিসপত্রের টাকা সামনে মাসের প্রথম সপ্তাহে দিলে হবে কিনা দোকানদার রাজি হয়ে গেল। এ কারণে তার যে টাকা থেকে গেল সেই টাকা দিয়ে সে মাংস আর মাছ কিনতে পারল। আর কেন যেন মাছ আর মাংস কেনার পর তার মেজাজটা খুব ফুরফুরে হয়ে গেল।

বাসায় ফিরে ইমরান তো বিস্মিত! পরী বাসাটাকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে ফেলেছে। সবকিছু পুরাতন হলেও যেন ছবির মতো লাগছে। ঘরের জিনিসপত্র যে এত সুন্দরভাবে সাজানো যায় তা তার জানা ছিল না। ইমরান অনুভব করল, পরী তার এই ভাঙ্গা বাসাটাকে নিজের মতো করে একেবারে আপন করে নিয়েছে। সবচেয়ে যে ব্যাপারটা ইমরানের ভালো লাগল তা হলো পরীর হাতের দুধ চা। হাত-মুখ ধূয়ে এসে চেয়ারে বসতে পরী তাকে ধোঁয়া উড়া গরম এক কাপ দুধ চা দিল। চাটা মুখে দেয়ার পর ইমরানের চোখে পানি চলে আসার মতো অবস্থা হলো। এত স্বাদের চা সে আগে কখনও খায়নি। কৃতজ্ঞতায় তার খুব ইচ্ছে হলো পরীর সুন্দর মুখটাতে একটা চুমু দিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস করে উঠতে পারল না। শুধু ছোট্ট করে একটা ধন্যবাদ দিল।

৮

ইমরান সন্ধ্যায় ডাক্তার তরফদারের সামনে বসে আছে। ডাক্তার তরফদারের এই রুমে সে আগে কখনও আসেনি। বিশাল রুমের সবটাই বইতে ঠাসা। এত বই দিয়ে ডাক্তার তরফদার কি করে আর এত বইয়ের কিইবা প্রয়োজন তা ঠিক বুঝতে পারে না ইমরান।

ডাক্তার তরফদার চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা বই পড়ছিলেন। প্রায় সাত মিনিট পর বইটা বন্ধ করে বললেন, কী খবর বলো?

স্যার আপনি যে টেস্টগুলো করতে বলেছিলেন সেগুলো করিয়ে এনেছি।

গুড, দাও আমাকে দাও। পরীর কী অবস্থা?

ভালো স্যার।

আর কোনো সমস্যা হয়েছিল?

না হয়নি।

প্যাথলজিক্যাল রিপোর্টের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইইজি বা ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম (Electroencephalogram) রিপোর্ট। ঐ রিপোর্টির উপর চোখে রেখে ডক্তার তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, সারাদিন পরী কি করেছে?

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার জন্য চা বানিয়েছে। তারপর আমার সাথে নাস্তা করেছে। বাজার করে আনার পর আমার সাথে বাইরে গিয়ে সবগুলো প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করেছে। দুপুরে দুজনে একসাথে বাইরে খেয়েছি। ফিরে এসে লম্বা একটা ঘুম দিয়েছে। আমি যখন রিপোর্ট আনতে যাই তখন ঘুমিয়েছিল। ফিরে এসে দেখি রাতের রান্না করছে। আমি যখন আপনার এখানে আসি তখনও রান্না করছিল।

পরীর সারাদিনের ব্যবহার তোমার কেমন লেগেছে?

ইমরান বেশ আগ্রহ নিয়ে বলল, ভালো, খুব ভালো।

চোখে পড়ার মতো কিছু কি করেছ সে?

ঠিক বুঝলাম না স্যার।

তার মধ্যে গতকালকের মতো কি অস্বাভাবিক কোনো আচরণ পরিলক্ষিত হয়েছে? অথবা অন্য কোনো আচরণ যা তার করার কথা নয়, অথচ সে করেছে।

ইমরান খানিকটা চিন্তা করে বলল, না স্যার।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাচ্ছ তার আচরণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

জি স্যার।

আমার এই রিপোর্টগুলোও একই কথা বলছে। শারীরিকভাবে পরী সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে..

তবে কি স্যার?

পরীর মানসিক অবস্থাটা জানতে হবে। সম্ভবত সমস্যাটা মানসিক। কোনো কারণে মানসিকভাবে সে আঘাত পেতে পারে।

মানসিকভাবে আঘাত পাবে কেন?

ডাক্তার তরফদার ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হয়তো তুমি নিজেই তার মানসিক আঘাতের কারণ।

ইমরান অবাক হয়ে বলল, আ..আ..আমি!

হ্যাঁ তুমি। হয়তো জিজ্ঞেস করবে কীভাবে? তুমি কি জানো পরীর বয়স কত?

আমি ঠিক জানি না। তবে শুনেছি সতের বছর দুই মাস। পরীর বাবা বলেছিল।

অর্থাৎ পরীর আঠার বছর হয়নি। কাজেই পরী শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না, অথচ তুমি তাকে বিয়ে করেছ। এজন্য পরী তোমাকে দেখলেই ভয় পাচ্ছে, বিশেষ করে রাতের বেলায়। তোমার সামনে সে যে দু'বার অনাকাঙ্খিত আচরণ করেছে, তার মধ্যে যে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গেছে, ঐ দুবারই তুমি তার সাথে একা ছিলে এবং...

ইমরান অধৈর্য হয়ে বলল, স্যার আমি কখনোই শারীরিক সম্পর্ক বিষয়ে কিছু বলিনি কিংবা ইঙ্গিতও করিনি।

হয়তো করোনি। কিন্তু ওর মনে ভয়টা আছে। ঐ ভয়ের তীব্রতা থেকে কনভালসন বা শারীরিক কাঁপুনি হয়েছে। যাইহোক, এরকম হতে পারে। এখন তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে শারীরিক সম্পর্ক থাকে সেদিকে মোটেও অগ্রসর হবে না। সবকিছু পরীর উপর ছেড়ে দেবে। পরী যখন নিজে থেকেই তোমার কাছে আসবে তখন তুমি আগ্রহী হবে। মনে রাখবে ওর মনটা এখন কচি। লক্ষ্য রাখবে কচি মনে যেন কোনো আঘাত না লাগে।

ইমরান কথাগুলোতে লজ্জা পাওয়ার পাশাপাশি বিব্রতবোধও করল ।

ডাক্তার তরফদার এবার খানিকটা সামনে ঝুকে এসে বললেন, আমার কথায় তুমি কষ্ট পাবে না। আমি যা সত্য তাই বললাম। তবে আমার বিশ্বাস, পরীর অসুস্থতার কারণ তুমি নও। তুমি মূল কারণ হলে পরী তোমার সাথে আরও অনাকাঙ্খিত আচরণ করত। তুমি জানিয়েছ, পরী যেন ভয় না পায় সেজন্য সে তোমাকে তার পাশে থাকতে বলে। এতে বোঝা যায় তোমার উপর তার আস্থা আছে। এই আস্থা প্রমাণ করে পরী তোমাকে অপছন্দ করে না। অপছন্দের মানুষের উপর কেউ কখনও আস্থা রাখতে পারে না। সেক্ষেত্র প্রশ্ন দাড়ায়, পরী তাহলে কাকে ভয় পায় বা কাকে অছন্দ করে? কিংবা কী কারণে পরীর মধ্যে অনাকাঙ্খিত আচরণের সৃষ্টি হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজে পেতে হবে। আর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের পরীর অতীত ইতিহাস জানতে হবে। আমি ঐ প্রসঙ্গে পরে যাব। এখন তুমি আমাকে বলো, পরী যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার আচরণ কেমন হয়?

স্যার এ কথা আপনাকে আমি আগে বলেছি।

আবার বলো, আমি আবার শুনতে চাই।

ইমরান একটু সময় নিয়ে বলতে শুরু করল, আমি যে দু'বার দেখেছি তাতে মনে হয়েছে পরী প্রথমে চুপ থাকে। তারপর হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে। ঐ কান্নার মধ্যেই পরীর শরীরে কাঁপুনি আসে। প্রথমে কাঁপে মুখ, ঠোঁট, তারপর হাত, তারপর সমস্ত শরীর। এর মধ্যে মুখটা বিকৃত হতে থাকে। মুখ দিয়ে গো গো শব্দ বের হয়, মনে হয় কিছু যেন বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারে না। ততক্ষণে ব্যথায় পরীর চোখ দিয়ে তখন পানি বের হয়ে আসে। একসময় ভারসাম্য হারিয়ে সে নিচে পড়ে যায়। তখন মনে হয়ে শরীরের উপর পরীর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। শরীরটা তখন ধীরে ধীরে উল্টো দিকে বাঁকা হতে থাকে। হাত পাও অদ্ভুতভাবে বেঁকে যায়, আমার মনে হয় যে কোনো সময় পরীর শরীরের একটা কিংবা দুটো হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে। তখন দৃশ্যটা যে কী বিভৎস হয় না দেখলে আপনাকে বোঝান যাবে না। তীব্র ব্যথায় ছটফট করতে থাকে পরী। চোখ দিয়ে গল গল করে পানি বেরিয়ে আসে। আশেপাশের সবকিছু তখন হাত পায়ের আঘাতে ছিটকে যায়। আমি গতদিন থামাতে দিয়ে লক্ষ্য করেছি পরীর শরীরে অসুরের শক্তি থাকে। একজনের পক্ষে থামান সম্ভব না। তারপর হঠাৎই সবকিছু থেমে যায়। পরী তখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মনে হয়

শরীরে আর কোনো শক্তি নেই, সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন নড়াচড়া করা তো দূরের কথা, কথা বলার মতো শক্তিও পরীর থাকে না। সম্পূর্ণ শরীরটা নেতিয়ে পড়ে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি মরা মানুষ।

ডাক্তার তরফদার ঠোঁট কাঁমড়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, পরী যখন পরেরবার অসুস্থ হবে তখন সাথে সাথে আমাকে জানাবে।

জ্বি স্যার।

দেরি করবে না।

ঠিক আছে স্যার।

ডাক্তার তরফদারকে খুব চিন্তিত দেখাল। তিনি আগের মতোই ঠোঁট কাঁমড়ে বললেন, তুমি পরীর পারিবার সম্পর্কে তেমন কিছু জানো না, তাই না?

না স্যার।

এখানে আসার সময় পরী কি সাথে কোনো ব্যাগ এনেছে?

জ্বি স্যার, একটা ব্যাগ এনেছে।

ব্যাগের মধ্যে কি আছে?

আমি দেখিনি।

ঐ ব্যাগের মধ্যে কি আছে তুমি সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। সন্দেহজনক কোনোকিছু পেলে আমাকে জানাবে।

পরীর অনুমতি ছাড়া পরীর ব্যাগের ভিতর কী আছে দেখা কী ঠিক হবে?

আমিও তোমার সাথে একমত। তবে তোমাকে মনে রাখতে হবে এটা তার চিকিৎসার একটা অংশ। জন্ম থেকে এখন র্যন্ত গত সতের বছরে পরীর জীবনে কী কী ঘটেছে তা আমার জানতে হবে। যদি জানতে না পারি, তাহলে চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না। বুঝতে পেরেছ?

জ্বি স্যার।

গুড, আমি তোমাকে এখন কতগুলো ছবি দেখাব। ছবিগুলো দেখে তুমি বলবে পরী যখন অসুস্থ হয় তখন পরীর শারীরিক পরিবর্তন, আচরণ বা বিকৃতি কোনটির সাথে মিলে যায়।

কথাগুলো বলে ডাক্তার তরফদার মোটা একটা অ্যালবাম বের করলেন। অ্যালবামের মধ্যে অনেক ছবি। অধিকাংশই বিভিন্ন বয়সী মেয়েদের। ইমরান প্রায় একশর মতো ছবি দেখে চারটি ছবি সনাক্ত করল।

ডাক্তার তরফদার ছবিগুলো আলাদা করে রাখলেন। তারপর বললেন, আপাতত কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই। তবে তুমি যতক্ষণ পার পরীর সাথে থাকবে। তুমি যত তাকে সময় দেবে তত দ্রুত পরী সুস্থ হয়ে উঠবে।

স্যার, আমি কীভাবে সময় দেব? আগামীকাল থেকে আমার অফিস। অফিসে সারাদিন ব্যস্ততা। তার উপর পরশুদিনের মধ্যে আপনার বাসা ছেড়ে দিতে হবে। এখনও বাসা দেখিনি, নতুন বাসা খুঁজতে হবে।

ডাক্তার তরফদার কিছুক্ষণ স্থির চোখে ইমরানের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, অফিসের কথা আমি বলতে পারব না। তবে বাসার কথা আমি বলতে পারি, আপাতত তোমার বাসা ছাড়ার দরকার নেই। এই বাসায়ই থাকো। পারলে বাড়ি থেকে কাউকে এনে রাখো যাকে পরী পছন্দ করে। এতে পরীর সময় ভালো কাটবে। আর হ্যাঁ, এ মাসে তোমার বাড়ি ভাড়া দেয়ার

দরকার নেই। তোমরা নতুন বিয়ে করেছ, আমার উচিত ছিল তোমাদের কিছু গিফট্ দেয়া। কিন্তু পারিনি। বাড়ি ভাড়ার টাকা দিয়ে পরীকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দিও। ওটা খুব কাজে লাগবে।

ইমরান কী বলবে কিছু বুঝতে পারল না। তার মনে হচ্ছে তার মাথা থেকে দশমনি একটা বোঝা নেমে গেল। অথচ সকাল থেকে বাসা খোঁজার চিন্তাটা তাকে অস্থির করে রেখেছিল। আর মোবাইল ফোনের টাকাটা নিয়েও তার খুব দুশ্চিন্তা ছিল। কারণ দুপুরে বাইরে খেতে গিয়ে কিছু বাড়তি টাকা খরচ হয়ে গেছে। এখন সেই সমস্যারও সমাধান হয়ে গেছে। কী অদ্ভুত!

ডাক্তার তরফদার তাড়া দিয়ে বললেন, কি ভাবছ? যাও বাসায় যাও, পরীর কাছে যাও। ওর তোমাকে প্রয়োজন।

ইমরান উঠে চলে যাচ্ছিল। দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে বলল, স্যার, আপনি অনুমতি দিলে আর একটা কথা বলতাম।

কী কথা?

আপনি বলেছিলেন পরীর আচরণে অসুস্থতা ছাড়া আমি অস্বাভাবিক কোনোকিছু দেখছি কিনা। আমার মনে হয় একটা অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে আপনাকে বলা দরকার।

কী অস্বাভাবিকতা?

পরীকে নিয়ে ঢাকা রওনা দেয়ার পর থেকে আমার জীবনে সব অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটছে। আমার সব সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যাচ্ছে। পরী কিছু কিছু বিষয় আগে থেকে জানতে পারছে।

কী রকম?

গতকাল ঢাকা আসার সময় আমরা প্রথম যে বাসটিতে ছিলাম, পরী সেই বাসে কয়েকজন পুলিশ উঠার পরী বলেছিল পরের বাসে ঢাকা আসবে। আমরা এসেছিলাম পরের বাসে। আসার সময় দেখি প্রথম বাসটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে। এরপর রাতে বাসস্ট্যান্ডে নামার পর আপনার ভয়ে এই বাড়িতে আসতে চাইনি। কিন্তু পরী বলল, কোনো সমস্যা হবে না। আসলেই সমস্যা হয়নি। নতুন বাসা ভাড়া করা নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম, কিন্তু পরী বলেছিল এই বাসায়ই আমরা আরও কিছুদিন থাকতে পারব এবং এখন তাই হলো। সত্যি কথা বলতে কি স্যার, নতুন মাস আসার আগে আমি খুব আর্থিক সমস্যায় ছিলাম। অথচ আজ সকালে মুদি দোকানদার আমাকে সব মাল বাকিতে দিল। আমি খুব অবাক হয়েছি। আর পরীকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দেয়ার ইচ্ছে আমার আগে থেকেই ছিল। কিন্তু টাকা কোথায় পাব সেটা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। অথচ আপনার মাধ্যমে সেটারও সমাধান হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছি না এত সব সমস্যার সমাধান কীভাবে হচ্ছে?

ডাক্তার তরফদার হেসে দিয়ে বললেন, তুমি যেগুলো বললে এগুলো কোনো সমস্যা না। তোমার মূল সমস্যা এখন পরীকে সুস্থ করে তোলা। আমি যা যা বললাম সেগুলো করো। দেখবে পরী সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে মনে রাখবে পরীর চিকিৎসার প্রয়োজন। আর চিকিৎসার জন্য যা যা করার সব তোমাকে করতে হবে। মানসিক রোগ কিন্তু কখনও ওষুধে সারে না, সারে মনের যন্ত্রণা নিরসন করলে। পরীর মনের মধ্যে যে যন্ত্রণা আছে সেটা খুঁজে বের করে তোমাকে দূর করতে হবে। তাহলেই পরী শান্তি পাবি।

ইমরান আর কথা বলল না। ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ডাক্তার তরফদার ঠিকই লক্ষ্য করলেন ইমরান বের হয়ে যাওয়ার সময় ইমরানের চোখে আনন্দাশ্রু চলে এসেছে। তিনি মনে মনে

ঠিক করলেন, যেভাবেই হোক তিনি পরীকে সুস্থ করে তুলবেন, অন্তত ইমরানের জন্য। কারণ ইমরান ছেলেটি সত্যি খুব ভালো এবং তার খুব পছন্দের।

৯

পরীর রান্না সত্যি সুন্দর। রাতে খাবার মুখে দিয়েই বুঝতে পারল ইমরান। পরীও তার সাথে খাচ্ছিল। খেতে খেতে ইমরান বলল, পরী, তুমি খুব ভালো রাধো।

পরী কোনো কথা বলল না, শুধু মিষ্টি করে হাসল।

ইমরান বলল, তুমি কি বাড়িতে রাঁধতে?

মাঝে মধ্যে। তুমি খেতে পারছ?

হ্যাঁ। আমার কাছে মনে হচ্ছে এর থেকে ভালো রান্না আর সম্ভব না।

পরীর হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো। তবে সে কিছু বলল না।

ইমরান পরীর চোখে তাকিয়ে নিজেও হাসি দিল। পরীকে দেখতে তার সবসময় ভালো লাগে। আরও ভালো লাগে পরীর কথা শুনতে। পরী সম্পূর্ণ শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে। গ্রামের একজন মেয়ের এরকম শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার কথা না। সে নিজেও মাঝে মাঝে গ্রামের ভাষায় কথা বলে ফেলে। অথচ পরী সেটা করে না। ব্যাপারটা অবাক করার মতো। কীভাবে সম্ভব হলো জানতে সে জিজ্ঞেস করল, পরী, তুমি সবসময় শুদ্ধ ভাষায় কথা বলো? শিখলে কীভাবে?

আমাদের বাড়িতে একজন গৃহশিক্ষক ছিল, নাম হাসান। সে শিখিয়েছে।

খুব সুন্দর শিখিয়েছে। তার সাথে দেখা হলে ধন্যবাদ দিতাম।

কেন?

তোমাকে এত সুন্দরভাবে বাংলা শিখিয়েছে এজন্য। কোথায় সে?

চলে গেছে।

কোথায় গেছে?

পরী ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তার নিজের বাড়িতে।

ও আচ্ছা, কখনো আসলে আমাকে বলো।

পরী কোনো উত্তর দিল না। চুপচাপ খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে দুজনে বেড রুমে এলো। ইমরান বলল, পরী তোমাকে দুটো সুখবর দেয়া হয়নি। শুনলে তুমি খুব খুশী হবে?

কী সুখবর?

আমরা আরও কিছুদিন এই বাড়িতে থাকতে পারব। ডাক্তার তরফদার আজ বলেছেন। আরও কি বলেছেন জানো?

না।

এমাসে বাড়ি ভাড়া নেবেন না।

তাই নাকি?

হু। আর আমি ভাবছি ঐ টাকা দিয়ে তোমাকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দেব। তাহলে যখন ইচ্ছে আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারব। তুমিও আমার সাথে কথা বলতে পারবে। অবশ্য এটা ডাক্তার তরফদারেরও ইচ্ছে। ভালো হবে, তাই না?

হ্যাঁ। কিন্তু আমি জানি না মোবাইল ফোন কীভাবে চালাতে।

আমি শিখিয়ে দেব। খুব কঠিন কিছু না। আগামীকাল থেকে আমার অফিস। তোমাকে একা একা থাকতে হবে। ভয় পাবে না তো?

পরী ইমরানের চোখে তাকিয়ে বলল, তোমার অফিস কয়টা পর্যন্ত?

বিকেল পাঁচটা। আসতে আসতে সাড়ে ছয়টা বেজে যাবে।

না ভয় পাব না। তবে দেরি করো না।

না দেরি করব না, অফিস থেকে সরাসরি বাসায় চলে আসব।

খাওয়া শেষ হলে ইমরান করার মতো কিছু পেল না। তার মনে হলো রুমের মধ্যে সে আর পরী চুপচাপ বসে আছে। নীরবতা ভাঙতে বলল, পরী, চলো ছাদে যাই, এই বাড়ির ছাদটা খুব সুন্দর। ছাদে পুরাতন একটা টেলিস্কোপ আছে, সেটা দিয়ে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র দেখা যায়।

এত রাতে ছাদে যাব?

এখন তো কেবল দশটা বাজে। ঢাকায় দশটা কোনো রাতই না।

অন্য একদিন যাব, আজ আমার ঘুম পাচ্ছে। তাছাড়া...

তাছাড়া কি?

কেমন যেন ভয় ভয়ও করছে।

ইমরান কিছু বলল না। সে নিচে পাটি বিছাতে শুরু করল। পরী অবাক হয়ে বলল, নিচে পাটি বিছাচ্ছ যে?

আমি নিচে ঘুমাব, তুমি উপরে ঘুমাও।

কেন?

পরী, আমার কী মনে হয় জনো? তুমি আমাকে ভয় পাও। এজন্য তুমি রাতে অসুস্থ হয়ে পড়ো। তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি কোনো বিষয়ে তোমাকে জোর করব না। আমি অতটা খারাপ মানুষ নই। তুমি যেদিন আমাকে ডাকবে সেদিনই আমি তোমার কাছে আসব। অন্য কোনো সময় না।

পরী উঠে এসে ইমরানের হাত থেকে পাটিটা নিয়ে রান্নাঘরে রেখে এলো। তারপর বলল, তুমি খাটেই ঘুমাবে এবং আমার পাশে। এসো, উপরে এসো।

ইমরান এরকমটা আশা করেনি। সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। পরীও তার পাশে এসে শুলো।

ইমরানের খুব ভয় ভয় করছে, সে পরীর দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। কারণটা সে বুঝতে পারছে, আজ রাতে সে পরীর ব্যাগের ভিতরে কী আছে তা দেখব। এই অন্যায় প্রবণতাটা তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করে ফেলেছে। এজন্য তার বার বার মনে হচ্ছে আজ রাতে পরীর পাশে না ঘুমালেই ভালো হতো।

পরী শোয়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল। পরীর দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ার কারণটা বুঝতে পারল ইমরান। শারীরিকভাবে পরী খুব দুর্বল, তার উপর আজ সারাদিন পরী অনেক কাজ করেছে। এজন্য শোয়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইমরান কিছুক্ষণ মুগ্ধ নয়নে পরীর দিকে তাকিয়ে থাকল। কী সুন্দর তার পরী! তার শুধু তাকিয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে। পরীর মুখে প্রায়ই কিছু চুল এসে পড়ে। আজও কয়েকটা চুল এসে পড়েছে। ফ্যানের বাতাসে সেগুলো পরীর মুখের উপর হুটুপুটি খাচ্ছে। ইমরানের খুব ইচ্ছে হলো চুলগুলোকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে। কিন্তু সাহস পেল না। শেষে পরী যদি অন্য কিছু মনে করে তাহলে অন্য বিপদ ঘটবে। এ মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে সে সবকিছু হারাতে পারলেও পরীকে হারাতে পারবে না। পরী এখন তার অস্তিত্বের সাথে মিশে গেছে। সে এবং পরী দুজনে এখন এক সত্ত্বা।

আধ-ঘণ্টা পর ইমরান খুব সতর্কতার সাথে বিছানা থেকে নামল। তারপর কোনোরকম শব্দ ছাড়াই পরীর ব্যাগটা খুলল। ভিতরে কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছু নেই। একটা অ্যালবামে পরীর

কিছু ছবি পেল। সাথে তাদের বিয়ের কয়েকটা ছবিও আছে। ছবিগুলো দেখে খুব অবাক হলো ইমরান। পরী তাকে ছবিগুলোর কথা বলেনি, সে আগে ছবিগুলো দ্যাখেওনি। মনে মনে ঠিক করল কোনো একটা অজুহাতে দিনের বেলায় ছবিগুলোর কথা তুলে ছবিগুলো নিয়ে পরীর সাথে আলোচনা করবে।

ব্যাগের একেবারে নিচে কোনার দিকে ইমরান নীল রঙের পলিথিনে প্যাচানে একটা চিঠি পেল, কিন্তু কোনো খাম নেই। সে অনুমান করল চিঠিটা কাছের কেউ লিখেছে, এজন্য পোস্ট করার জন্য খাম ব্যবহার করেনি। চিঠিটা দেখার পর ইমরানের শরীর কাঁপতে শুরু করল। কারণ সম্বোধনের স্থানে 'প্রিয়া' শব্দটি লেখা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

প্রিয়া,

তোমাকে দেখি আর আমি পাগল হয়ে যাই। তুমি এত সুন্দর! মাঝে মাঝে তোমাকে অবিশ্বাস্য সুন্দর মনে হয়। মনে হয় তুমি পৃথিবীর কেউ নও, স্বর্গ থেকে আসা কেউ। বিধাতা যেন তোমাকে একবারে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন। তোমার এই সৌন্দর্যে সত্যি আমি হারিয়ে যাই, হারিয়ে যাই অজানা কোথাও যেখানে শুধুই তুমি আর আমি। গতকাল তোমাকে পড়ানোর সময় এরকম হারিয়ে গিয়েছিলাম। এজন্য তোমাকে ঠিকমতো পড়াতে পারিনি। আসলে তোমার সামনে গেলে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না, ইচ্ছে করে সরাক্ষণ তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি, তোমার চুলের দিকে তাকিয়ে থাকি, তাকিয়ে থাকি তোমার ঐ অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে। জানি না আমার এই তাকিয়ে থাকার পালা কখনও শেষ হবে কিনা। যখন আমি একা থাকি তখনও তোমাকে খুঁজি, শুধুই তোমাকে। তুমি বাড়িভর ছুটে বেড়াও আর আমি দেখি। অথচ তোমার কাছে যাওয়ার স্পর্ধা আমার নেই। ব্যাপারটা যে কি কষ্টের তোমাকে বোঝাতে পারব না। পরশুদিন তুমি যখন আমাকে খাবার দিতে এলে তখন আনন্দে আমার চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিলে। কিন্তু তুমি থাকলে না, খাবার দিয়েই চলে গেলে। যাওয়ার সময় শুধু মুচকি একটা হাসি দিলে। তোমার ঐ হাসিই আমার জীবনের সব। জানি না তোমাকে কবে আমি আমার মতো করে পাব, অবশ্য আমার ভাগ্যে তুমি আছ কিনা তাও জানি না। কারণ চারপাশে যারা আছে কেউ যে আমার পক্ষে নেই। শুধু আছ তুমি, শুধুই তুমি। কিন্তু তুমি আমি দুজনে কি পারব? তাও জানি না। তাই মনটা মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যায়। তখন তোমার পুরাতন চিঠিগুলি পড়ি, পড়ি তোমার ভালোবাসা আর ভালোলাগার কথাগুলো। এতে মন অনেকটা শান্ত হয়, শান্ত হয় এই ভেবে যে তুমি আমার পাশে ছিলে, আছ এবং থাকবে। হয়তো এটাই আমার সান্ত্বনা এবং জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া!

ইতি
তোমারই প্রিয়

চিঠি পড়ার পর ইমরান এসে দাঁড়াল পরীর পাশে। পরী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ইমরান দেখছে আর দেখছে। সেই নিস্পাপ আর পবিত্র চেহারা! অথচ কষ্ট, বুকের ভিতর কষ্ট, ভয়াবহ কষ্ট! ইমরান বুঝতে পারছে সে তার জীবনে আগে কখনও এতটা কষ্ট পয়নি।

ইমরান পরীর পাশে আগের জায়গায় শুয়ে পড়ল। সে অনুভব করছে তার খুব ক্লান্ত লাগছে। একটু আগে যেখানে কষ্ট ছিল এখন সেখানে শুধু ক্লান্তি আর ক্লান্তি। এত ক্লান্তি যে সে চোখ মেলে রাখতে পারছে না, অথচ তার খুব ইচ্ছে করছে পরীকে দেখতে, মন ভরে দেখতে। কিন্তু সে পারল না, সত্যি পারল না। একসময় হারিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

মেঘের গর্জনে ইমরানেরর ঘুম ভাঙল। বিছানায় পরীকে না দেখে চমকে উঠল সে। বাথরুমে, রান্নাঘরে কোথাও পরী নেই। রাত সাড়ে তিনটা বাজে। এ সময় পরী কোথায় যাবে? আবার বিছানার কাছে ফিরে আসতে জানালা দিয়ে তার চোখ বাইরে গিয়ে পড়ল। যা দেখল তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না ইমরান। পরী বড় চালতা গাছের চারদিকে মাথা নিচু করে হাঁটছে। পরীর আচরণ দেখে মনে হচ্ছে পরী বুঝি মাটির মধ্যে কিছু একটা খুঁজছে। ইমরানের কাছে দৃশ্যটা খুবই ভয়ংকর মনে হলো। সে আর দেরি করল না, দ্রুত নিচে নেমে এলো। নিচে এসে দেখে ডাক্তার তরফদার আর করিম চাচা দাঁড়িয়ে আছে। তারাও তাকিয়ে আছে পরীর দিকে। ডাক্তার তরফদার বিড় বিড় করে বলল, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে পরী নিচে নেমে শুধু গাছের চারদিকে চক্কর দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কি করে দ্যাখো।

ইমরান অস্থির হয়ে বলল, স্যার বৃষ্টি হতে পারে।

হলে হবে। পরীকে পরীর কাজ করতে দাও। পরীকে সুস্থ করে তোলার জন্য পরীকে পর্যবেক্ষণ খুব জরুরী।

ইমরান দাঁড়িয়ে ছটফট করতে লাগল। বৃষ্টি হলে নির্ঘাত পরী ভিজে যাবে। অবশ্য বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই পরী ধপ্ করে নিচে পড়ে গেল। সাথে সাথে ছুটে গেল ইমরান। কাছে গিয়ে দেখল, মাটিতে পরে পরীর শরীরটা থর থর করে কাঁপছে। বিশ্রীভাবে বেঁকে যাচ্ছে হাত আর পা, ঠিক যেমন গতকাল হয়েছিল। শরীরটাও ঘামে ভিজে গেছে। চোখের মনি দুটো চক্রাকারে চারদিকে ঘুরছে। যে কেউ দেখলে নিশ্চিত ভয় পাবে।

এক মিনিটের মাথায় পরীর শরীরটা নিস্তেজ হয়ে এলো। ডাক্তার তরফদার বিড় বিড় করে বললেন, ইমরান, পরীকে উপরে নিয়ে যাও, ওর খুব কষ্ট হয়েছে।

ইমরান যখন পরীকে পাজাকোলে করে উপরে নিয়ে যাচ্ছে তখন তার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে পানি পড়ছে। কেন যেন পরীর জন্য তার খুব কষ্ট হচ্ছে। রাতে চিঠিটা দেখার পর সে ভেবেছিল পরীর জন্য তার বোধহয় আর কষ্ট হবে না। কিন্তু সে বুঝতে পারছে পরীর জন্য তার কষ্ট শুধু বাড়ছে আর বাড়ছে।

১০

সন্ধ্যায় ইমরান ডাক্তার তরফদারের সামনে বসে আছে। ডাক্তার তরফদার খুব মনোযোগের সাথে পরীর ব্যাগ থেকে নিয়ে আসা চিঠিটি পড়ছেন। আজ সারাদিন ইমরানের খুব খারাপ কেটেছে। অফিসে প্রতিটা মূহূর্ত সে অস্থির ছিল, কাজে মনোযোগ বসাতে পারেনি। পরীকে একা বাসায় রেখে যাওয়াটাই ছিল তার অস্থিরতার মূল কারণ।

চিঠি পড়ে ডাক্তার তরফদার বললেন, তুমি মূল চিঠিটা রাখো। ফটোকপিটা আমাকে দাও।

ঠিক আছে স্যার।

চিঠি পড়ে তোমার নিশ্চয় মন খারাপ হয়েছে?

না স্যার।

ডাক্তার তরফদার মৃদু হেসে বললেন, তুমি সত্য বলছ না। আমি জানি তোমার মন খারাপ হয়েছে। চা খাবে?

না স্যার।

কেন? আমি কম মানুষকেই চা খাওয়াই। পৃথিবীতে আমি একটা জিনিসই খুব ভালো বানাতে পারি, আর তা হলো চা। এই চা আমি খুব তৃপ্তির সাথে খাই। আমার সাথে এক কাপ চা খাও।

ইমরান ইতস্তত করে বলল, সকালে পরীকে বলেছিলাম সন্ধ্যায় একসাথে চা খাব।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে আমার কাছে তোমার চা পাওনা থাকল। এখন বলো সকালে পরীর আচরণ কেমন ছিল?

রাতের কোনোকিছু পরী মনে করতে পারেনি। সকাল থেকে সে একেবারে স্বাভাবিক। আমার জন্য সে নাস্তা বানাল, একসাথে নাস্তা করলাম। বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় মোবাইল ফোন কিনে দেয়ার কথাটা মনে করিয়ে দিল। আরও বলল, যেন বেশি দামী ফোন না কিনি, কম দামী কিনি।

তুমি বলতে চাচ্ছ যে রাতে পরী যে চালতে গাছের চারদিকে ঘুরেছে সেই ব্যপারটা সে ভুলে গেছে।

জি স্যার।

পরীর শরীরে মাটি লেগে থাকার কথা সেই মাটি দেখে পরীর সন্দেহ হওয়ার কথা।

হয়নি কারণ আমি ভিজা কাপড় দিয়ে পরীর হাতে লেগে থাকা মাটি মুছে দিয়েছিলাম।

ডাক্তার তরফদর চিন্তিমুখে বললেন, ব্যাপারটা ভালো না, পরী তার জীবনের স্মৃতি ভুলে যাচ্ছে।

ইমরান ঠোঁট কাঁমড়ে বলল, স্যার আমার খুব ভয় করছে।

কেন?

রাতে আবার পরী বের হয়ে না যায়। এজন্য বলছিলাম কলাপসিবল গেট তালা দিয়ে রাখলে ভালো হবে। গত রাতে সম্ভবত খোলা ছিল।

হ্যাঁ খোলা ছিল এবং করিম জেগে ছিল। সেই আমাকে ডেকে তুলেছে। তবে গেট বন্ধ করে রাখা যাবে না। তাহলে আরও ভয়ানক কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু তা ঘটতে দেয়া যাবে না। আসলে এখন পরীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। পরী যা করতে চায় তা তাকে করতে দিতে হবে। তার মতের বিরুদ্ধে গেলে সে জোর করে তার ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে যে তাকে বাঁধা দেবে আক্রোবশত তাকে আক্রমণ করবে।

আক্রমণ করবে?

শুধু আক্রমণ না, খুনও করতে পারে। এজন্য তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে। এটা সত্য পরী তোমাকে পছন্দ করে, কিন্তু পরী যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ঐ সময় সে কি করছে কিছুই বুঝতে পারে না। এজন্য বলছি খুব সবধানে থাকবে।

ইমরান আর থাকতে না পেরে বলল, স্যার পরীর কী অসুখ হয়েছে?

আমি এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। অনুমান করছি মাত্র। আমার আরও কিছু বুঝার বাকি আছে। যাইহোক, আবার চিঠির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এই চিঠিটি আমাদের জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা এই চিঠির সূত্র ধরেই এগোবে। আমি চিঠি পড়ে যা বুঝেছি তা হলো পরীর একজন পছন্দের মানুষ ছিল। সম্ভবত তার শিক্ষক এবং বাড়িতে এসে পড়াত। আমার ভুল না হলে এটা সত্য যে ঐ শিক্ষক পরীদের বাড়িতেই থাকত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঐ শিক্ষকের নাম কি এবং এখন সে কোথায়? এ বিষয়ে তুমি কিছু জানো?

গতরাতে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা প্রসঙ্গে বলছিল শিক্ষকের নাম হাসান এবং সে তার বাড়ি চলে গেছে।

বাড়ি কোথায়?

জানি না স্যার, জিজ্ঞেস করিনি। পরীকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে।

না জিজ্ঞেস করো না। পরী যেহেতু নিজে থেকে তার শিক্ষক সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলেনি, এই চিঠি সম্পর্কে কিছু বলেনি, এসম্পর্কে কোনোকিছুই পরীকে জিজ্ঞেস করা যাবে না। পরীর সাথে শুধু তালে তাল মিলিয়ে তোমাকে চলতে হবে। পারবে না?

ইমরান বেশ জোর দিয়ে বলল, পারব স্যার।

তোমাকে আমার খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। অথচ এরকম হওয়ার কথা ছিল না। বরং উচিত ছিল তোমার পরীর উপর রাগ হওয়া, বিরক্ত হওয়া। তাই না?

ইমরান মাথা নিচু করে বলল, জানি না স্যার।

সত্যি যদি পরীর শিক্ষককে খুঁজে পাওয়া যায় অথবা সে এসে উপস্থিত হয় তুমি কী করবে?

ইমরান দ্বিধীহীনভাবে বলল, আমি তাকে অনুরোধ করব সে যেন পরীকে বিয়ে করে এবং সুখে শান্তিতে সংসার করে।

ডাক্তার তরফদার ভ্রূ কুঁচকে বললেন, কেন তুমি এমন করবে? পরী তোমার স্ত্রী।

আমি চাই পরী সুখী হোক। পরী যদি তার শিক্ষককে পেয়ে সুখী হয় তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।

কেন আপত্তি

ইমরান লম্বা একটা শ্বাস টেনে বলল, আমি জানি না স্যার, তবে আমার কাছে পরী পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মেয়ে।

ডাক্তার তরফদার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, পরীর বিষয়ে আমার অনেক তথ্যের প্রয়োজন। আগামীকাল সকালে আমি পরীদের গ্রামে যাব।

ইমরানও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কী বলছেন স্যার!

হ্যাঁ।

কি...কিন্তু স্যার...

কোনো কিন্তু না, আমার কাজ আমাকে করতে দাও। আমি খুঁজে বের করে দেখতে চাই সমস্যাটা কোথায়।

থাকবেন কোথায়? খাবেন কি?

আমার সবকিছুর ব্যবস্থা হয়ে যায়। আমাকে নিয়ে কোনো চিন্তা করবে না। তুমি চিন্তা করবে তোমাকে নিয়ে এবং পরীকে নিয়ে। পরী যেন তোমার কোনো ক্ষতি না করে, আবার একইভাবে পরীর যেন কোনে ক্ষতি না হয়। এজন্য আমি না আসা পর্যন্ত খুব সাবধানে থাকবে। প্রয়োজনে আমি তোমাকে ফোন করব।

জ্বি স্যার।

তবে কোনো বিষয়ে সমস্যায় পড়লে বা পরীর মধ্যে অস্বাভাবিক কোনো কিছু দেখলে সাথে সাথে আমাকে জানাবে। দেরি করবে না। দেরি হলে পরীর জন্য অনেক বড় ক্ষতির কারণ হয়ে পড়বে। আর পরী যদি তোমাকে কোনো তথ্য দেয় যা তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আমাকে জানাবে।

ঠিক আছে স্যার।

রাতে যদি পরী আবার চালতা গাছের নিচে এসে কিছু খুঁজতে থাকে, খুঁজতে দেবে। বাঁধা দেবে ন। মনে রাখবে চালতা গাছ তার জন্য নিরাপদ।

ইমরান অধৈর্য হয়ে বলল, কিন্তু পরী ওখানে যাচ্ছে কেন?

সেই রহস্য উন্মোচন করতেই আমি পরীদের গ্রামে যাচ্ছি। এখন যাও, তুমি উপরে গিয়ে পরীর সাথে চা খাও। পরী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ঠিক আছে স্যার।

আর হ্যাঁ, পরীর বাবা নিরু মেম্বারকে জানিয়ে রেখো আমি তাদের বড়ি যেতে পারি।

ঠিক আছে স্যার।

ইমরান বের হয়ে গেল। পাঁচ মিনিট পর একটা বাটি হাতে আবার ফিরে এলো। ডাক্তার তরফদার তখন পুরাতন একটা খাতা যেখানে রুগীদের হিস্ট্রি লেখা হয় সেটা দেখছিলেন। চোখ তুলে তাকাতে ইমরান ভয়ে ভয়ে বলল, পরী আজ পায়েস রেঁধেছে? আপনাকে দিতে বলল।

ডাক্তার তরফদার পায়েসটা দেখলেন। তারপর ভিতর থেকে একটা চামচ এনে খানিকটা পায়েস মুখে দিয়ে বললেন, পরীকে বলো, পায়েস খুব সুন্দর হয়েছে। বহুদিন আমি এত স্বাদের পয়েস খাইনি।

ঠিক আছে স্যার জানাব।

ইমরান চলে যাওয়ার পর ডাক্তার তরফদার বেশ খানিকটা পায়েস খেলেন। পায়েসের স্বাদটা তার কাছে সত্যি অসাধারণ লেগেছে। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন পরীর সাথে যখন পরেরবার দেখা হবে তিনি সামনাসামনি পরীকে ধন্যবাদ দিবেন। এই ধন্যবাদ পরীর প্রাপ্য। তবে পরীর জন্য তার খুব খরাপ লাগছে। কারণ পরী সত্যি অসুস্থ। এই অসুস্থতাটা খুব মারাত্মক এবং ঝুকিপূর্ণ। এ ধরনের রুগীকে সম্পূর্ণ সুস্থভাবে বাঁচিয়ে তোলা খুব দুরহ ব্যাপার। তবে তিনি আশাবাদী, পরীকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারবেন। কারণ অন্তত একটা সূত্র তার হাতে আছে। আর তা হলো পরীর শিক্ষক হাসান।

১১

ডাক্তার তরফদার বিকেলে পরীদের গ্রামে এসে পৌঁছালেন। তিনি একা এসেছেন। এরকম গ্রামে আসা তার জন্য নতুন কিছু নয়। রুগীর চিকিৎসায় প্রয়োজন হলে তিনি অজ-পাড়াগায়ে চলে আসেন। কখনও তিনি পরিচতজনদের বড়ি উঠেন, কখনও রুগীর অভিভাবক বা আত্মীয় স্বজনের বাড়ি উঠেন, কখনও আবার তথ্য প্রদানকারীর বাড়িতে উঠেন, আবার কখনও চেয়ারম্যান মেম্বারদের বড়িতে উঠেন। তবে এবার তিনি উঠেছেন মসজিদে। মসজিদের ইমাম সাহেব মওলানা মকবুল খুব ভালো মানুষ। তিনি ডাক্তার তরফদারকে পেয়ে মহাখুশি। ডাক্তার তরফদার পরীর চিকিৎসার জন্য এসেছে শুনে ইমাম সাহেব আরও খুশি হলেন। মুড়ি আর গুড় দিয়ে প্রাথমিক আপ্যায়নের সময় নিজে থেকেই বললেন, আপনি আমার মেহমান হয়ে থাকবেন। যতদিন খুশি ততদিন থাকবেন। আপনি পরীকে সুস্থ করতে আসছেন, একজন মানুষরে নতুন জীবন দিতে আসছেন, এর থেকে ভালো কাজ আর কি হবার পারে? পরী মেয়েটা খুব ভালো ছিল। কিন্তু ক্যামনে যেন মথাটা বিগড়া গেল, বুঝলাম না। ভাবলে খুব কষ্ট হয়।

ডাক্তার তরফদার বললেন, আপনি পরীকে চিনতেন?

আমি এই গ্রামে আছি একুশ বছর। বলতে পারেন সবাইরে চিনি। পরী ছোটবেলায় এই মসজিদের মাদ্রাসায় এসে সিফারা পড়ত। পরে আমি বাড়িতে তাকে কোরআন পড়া শিখাইছি।

তাহলে তো পরীদের বাড়ির সবার সাথে আপনার ভালো পরিচয় আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। এই মসজিদে যখন আসি ওর বাবা নিরু মেম্বারের বাড়িতে আমি অনেকদিন ছিলাম। অবশ্য সেটা অনেক আগের কথা। পরীর তখন জন্মও হয় নাই।

ডাক্তার তরফদার বললেন, তারমানে পরীর জন্ম থেকে এখন পর্যন্ত সবকিছু আপনি জানেন।

হ্যাঁ জানি। আপনি যা জানতে চান আমাকে জিজ্ঞেস করুন, না জানলে যাকে আপনার দরকার তাকে আমি নিয়া আসব। গ্রামের সবাই আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। আমার বিশ্বাস, আপনার চিকিৎসা পেলে পরী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।

ডাক্তার তরফদার একটু সময় নিলেন, তারপর বললেন, পরীকে যে জ্বীনে ধরেছে এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

ইমাম সাহেব খানিকটা ভেবে বললেন, আমি নিশ্চিত না হয়ে কোনো কথা বলতে পারব না। তবে আমি বিশ্বাস করি সবকিছুর চিকিৎসা আছে। রুগীকে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারলে রুগী ভালো হয়।

ডাক্তার তরফদার বুঝলেন ইমাম সাহেব যৌক্তিক মানুষ। এ ধরনের মানুষের কাছ থেকে ভালো সাহায্য পাওয়া যায়। আবার এটাও সত্য যে ইমাম সাহেব বহুদিন নিরু মেম্বারের বাড়িতে ছিলেন। কাজেই ঐ বাড়ি সম্পর্কে নেতিবাচক কোনো তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি বেশি সতর্ক থাকবেন। সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন থেকে যেতে পারে।

ডাক্তার তরফদার এবার বললেন, পরী সম্পর্কে আপনি যতটুকু জানেন আমাকে বলুন। এই তথ্য আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ইমাম সাহেব একটু নড়ে চড়ে বসে বলতে শুরু করলেন, পরীর জন্ম এখন থেকে সতের বছর আগে। কিছু কম বেশি হতে পারে। পরী নিরু মেম্বারের বড় মেয়ে। ছোট মেয়ের নাম জরি। দুই মেয়ের মধ্যে পাঁচ বছরের ব্যবধান। পরীর জন্ম হওয়ার সময় আমি পরীদের বাড়িতেই ছিলাম। ধীরে ধীরে পরী বড় হতে থাকে। গ্রামের স্কুল আর মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে। এইখান থেকেই

এসএসসি পাশ করে। পরে ভর্তি হয় উপজেলার কলেজে। কিন্তু যাওয়া আসা পরীর জন্য বেশ ঝুকিপূর্ণ ছিল। কারণ পরী ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় অতিরিক্ত সুন্দরী। অনেক সময় প্রাইভেট পড়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। নিরু মেম্বার তখন খুব চিন্তায় পড়ে যায়। প্রায় বিশ বছর ধরে মেম্বার থাকায় তার কিছু শত্রুও আছে। এজন্য পরীকে নিয়ে তার ভয় বাড়তে থাকে। শেষে উপায় না দেখে ঐ কলেজে বিএ পড়ে এরকম এক ছাত্র, নাম হাসান তাকে বাড়িতে থাকতে দেয়। হাসান ছেলেটা খুব ভদ্র নম্র ছিল। সেই বাড়িতে থেকে পরীকে পড়াত। এতে পরীর কলেজে যাওয়া এবং বাইরে আসা অনেকটা কমে যায়। এর মধ্যে একটার পর একটা বিয়ের প্রস্তাবও আসতে থাকে। অনেকগুলো প্রস্তাব খুব ভালো হওয়ায় নিরু মেম্বার বিয়ের জন্য পরীকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। আমি শুনেছিলাম পরী রাজি হয়নি, সে আরও পড়াশুনা করতে চেয়েছিল। মাস দেড়েক আগে হাসান ছেলেটা তার বাড়িতে চলে যায়। তখন পরীর পড়াশুনাও থমকে যায়। পরীর পক্ষে আবার নিয়মিত কলেজে যাওয়া কঠিন ছিল। কারণ গ্রামের কিছু বখাটে ছেলের বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ার কারণে ওরাও পরীর পিছনে লেগেছিল। পরী তখন একেবারে ঘরকুনো হয়ে পড়ে। মানুষজনের সাথে কথা বলত কম। বিশেষ করে পড়াশুনা করতে না পারার বিষয়টা দারুন কষ্ট দিচ্ছিল পরীকে। এর মধ্যে নিরু মেম্বার পরীর বিয়ে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে। কিন্তু আগের মতোই পরী রাজি হয়নি। পনের ষোল দিন আগে হঠাৎ একদিন পরীর মা গোপনে আমার এখানে আসে। তারপর...

এ পর্যন্ত বলে ইমাম সাহেব সামনে রাখা এক গ্লাস পানি খেলেন। ডাক্তার তরফদার কোনো কথা বললেন না। ইমাম সাহেবকে তিনি সময় দিলেন। ইমাম সাহেব আবার বলতে শুরু করলেন, পরীর মা এসে আমাকে জানায়, পরী রাতে একা একা ঘর থেকে বের হয়ে যায়। তারপর তাদের বাড়ির পিছনের বাগানে ঘুরে বেড়ায়। ঐ বাগানে নাকি অনেক আগে জ্বীন ছিল। পরীর দাদীকে একবার ধরেছিল। অনেক কষ্টে সেই জ্বীন ছাড়ানো হয়। পরীর ঐরকম রাতে বের হয়ে যাওয়ার কথাটা পরীর মা পরীর বাবা নিরু মেম্বারকে বললে সেও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। নিরু মেম্বার তখন ব্যাপারটা কাউকে বলতে নিষেধ করে। তাতে মেয়ের বিয়ে দিতে সমস্যা হবে। আসলে নিরু মেম্বার পরীকে খুব ভালোবাসে। এজন্য পরীর কোনো ক্ষতি হোক তা নিরু মেম্বার চাইত না। আমি ঐ দিন পরীর মাকে পানি পড়া দেই। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। কারণ পরী আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর মধ্যে গত সপ্তাহে হঠাৎ শুনলাম পরীর বিয়ে হয়ে গেছে এবং প্রথম রাতেই পরীকে বাপের বাড়ি ফেরত পাঠান হয়েছে। কথা শুনে সত্যি আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। তবে জামাইটা ভালো, একদিন পরে এসে পরীকে নিয়ে যায়।

বাড়ির শিক্ষক হাসানের কি হলো?

হাসান নাকি বাড়ি চলে গেছে।

বাড়ি কোথায় হাসানের?

আমি জানি না। পরীদের বাড়ির লোকজন বলতে পারবে।

মানুষ হিসেবে হাসান কেমন ছিল?

খুবই সাধারণ এবং ভালো। অভাবী ছিল বলেই মানুষের বাড়ি থেকে পড়াশুনা করত। তবে মেধা ছিল ছেলেটার।

এই গ্রামে পরীর সবচেয়ে আপন কে ছিল? মানে বলতে চাচ্ছি পরীর বন্ধবী বা সমবয়সী কেউ যে পরী সম্পর্কে আরও তথ্য দিতে পারবে।

এরকম কেউ নেই। পরী ওর ছোট বোন জরীর সাথেই থাকত বেশি। বাড়ির বাইরে আসত কম।

গ্রামের মানুষের সাথে পরীদের পরিবারের সম্পর্ক কেমন?

ভালো মন্দ দুটোই আছে। মেম্বার মানুষ তো, অনেকে যেমন নিরু মেম্বাররে পছন্দ করে, কিছু মানুষ অপছন্দও করে। গ্রামে এরকমই হয়।

এর মধ্যে আযানের সময় হলে ইমাম সাহেব বললেন, নামাযের সময় হয়ে এলো। নামায পড়ে একসাথে রাতের খাবার খাব।

ডাক্তার তরফদার সম্মতি জানিয়ে নিজেও নামায পড়লেন। মসজিদের পাশে মাঠ। নামায শেষে মাঠের একেবারের কোনার চায়ের দোকানে এসে বসলেন। তারপর তাকালেন আকাশের দিকে। বেশ অনেকদিন হয়েছে তিনি খোলা মাঠে বসে আকাশের দিকে তাকাননি। অথচ এটা তার বড় শখ। আর একটা শখ তাদের বাড়ির ছাদের টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দেখা। এই অভ্যাসটা নাকি তার দাদারও ছিল। এখন তার মধ্যেও আছে। কী অদ্ভুত! তার আর তার দাদার মধ্যে অবিশ্বাস্য মিল! অথচ তার বাবার এই শখটা ছিল না। এভাবে জীবন প্রবাহে বৈশিষ্ট্যগুলো সুপ্ত থেকে আবার জাগ্রত হয়, এজন্যই জীবনটা অদ্ভুত, বিস্ময়কর - ভাবলেন তিনি।

ডাক্তার তরফদার এসব চিন্তা কেন করছেন তিনি জানেন না। মাঝে মাঝে তার নিজের মনে হয় মানসিক রুগীর চিকিৎসা করতে করতে তিনি নিজেই মানসিক রুগী হয়ে গেছেন। এরকম মনে হলে তিনি মিট মিট করে হাসেন। আর তার হাসি দেখে আশেপাশের সবাই তাকে হাসার কারণ জিজ্ঞেস করে। চায়ের দোকানের ছেলেটাও জিজ্ঞেস করল, স্যার আপনে হাসতেছেন ক্যান?

এমনিতেই হাসছি।

অ্যামনে অ্যামনে হাসে পাগল, আপনি কী পাগল?

না আমি পাগল না, পাগলের ডাক্তার।

ছেলেটা হাঁ করে ডাক্তার তরফদারের দিকে তাকিয়ে থাকল। ডাক্তার তরফদার বললেন, তুমি কী পরীদের বাড়ি চিন?

হঁ চিনি, নিরু মেম্বারের মাইয়া, ঐ যে যারে জ্বীনে ধরছিল।

পরীকে কি সত্যি জ্বীনে ধরেছিল?

আমি জানি না। বিয়ার পর একদিন বাড়ি আছিল। আমি অল্প সময়ের জন্য দ্যাখছিলাম। কিন্তু কিছু চোখে পড়ে নাই। বিয়ার আগে মেলা দেখছি। ওমন কিছু চোখে পড়ে নাই। কিন্তু মানুষে কয় তারে জ্বীনে ধরছে। আপনে বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করছেন। ঐ যে মাঠের ঐ কোনা দিয়া আপনি আগাইলে একটা বাঁশঝাড় পাবেন। বাঁশঝাড় পার হইলে পাবেন বড় একটা বাড়ি। চাইরপাশ তারকাটার বেড়া দিয়া ঘিরা। ঐডাই নিরু মেম্বারের বাড়ি।

ডাক্তার তরফদার উঠে যাওয়ার সময় বলল, তুমি হাসানকে চিনতে?

কোন হাসান?

পরীদের বাড়িতে থেকে পরীকে পড়াত।

চিনব না ক্যান? আমার দোকানে মাঝে মাঝে আইসা বসত। তার খুব দুঃখ আছিল?

ডাক্তার তরফদার চোখ কুঁচকে বললেন, কিসের দুঃখ?

তার একটা পা খাটো আছিল। এইজন্য ভালোমতো হাঁটতে পারত না, খোঁড়াইত। আর দৌড়াবার তো পারতই না। মাঠে সবাই যহন বল খ্যালত তহন আফসোস কইরা বলত, পা ভালো থাকলে হে সবাইর সাথে বল খেলবার পারত।

হাসান এখন কোথায়?

গ্রাম ছাইড়া চইলা গেছে।

যাওয়ার আগে তোমাকে বলে গেছে?

না বলে নাই।

তাহলে জানলে কীভাবে?

ছেলেটা ঠোঁট উল্টে বলল, আগে দেখতাম, এহন তো আর দেহি না।

ডাক্তার তরফদারের মনে পড়ল ইমাম সাহেব তার সাথে খাবে বলে বসে আছেন। যদিও তার ক্ষুধা নেই তারপরও তিনি উঠে পড়লেন। ইমাম সাহেবের সাথে তিনি রাতের খাবার খেতে চান।

১২

পরের দিন সকালে নিরু মেম্বার নিজেই মসজিদে চলে এলো। সে ইমরানের কাছ থেকে জানতে পেরেছে ডাক্তার তরফদার পরীর চিকিৎসার জন্য গ্রামে এসেছে। ইমরান বলে দিয়েছে তার যেন ভালো খেদমত করা হয়। এজন্য প্রথমেই এসে বলল, স্যার, আপনি উঠবেন আমার বাড়িতে, মসজিদে উঠছেন ক্যান?

ডাক্তার তরফদার হেসে দিয়ে বললেন, আপনাদের বাড়িতে উঠিনি এ কারণে যে আপনারা বিব্রত হবেন। এমনিতেই সবাই বলে পরীকে জ্বিনে ধরেছে। আবার আমি উপিস্থিত হলে গ্রামের নানাজনে নানা কথা বলবে, তখন ব্যাপারটা আপনার আমার দুজনের জন্যই অস্বস্তিকর হবে।

না না কিছু হবে না, আপনে আমার মেয়ের চিকিৎসার জন্য আসছেন। অবশ্যই আমার বাড়িতে উঠবেন। চলেন, এখনই চলেন, আপনে আমার মেহমান।

আমি এমনিতেই যেতাম। আপনাদের সাথে আমার কথা বলা দরকার। আপনি যখন বলছেন চলুন, তবে রাতে আমি আবার এখানে ফিরে আসব।

সেইটা পরে দেখা যাবে।

নিরু মেম্বারের সাথে লাঠি হাতে বিশালদেহী এক লোক এসেছে। নাম জয়নাল। নিরু মেম্বার ইশারা করতে জয়নাল ডাক্তার তরফদারের ব্যাগটা তুলে নিতে গেল। ডাক্তার তারফদার বললেন, এখন প্রয়োজন নেই, দরকার হলে আমি বলব। চলুন আপনাদের বাড়ি চলুন।

নিরু মেম্বারের বাড়ি অনেক বড় বাড়ি। বাড়িতে তিনটা দোচালা ঘর। বাড়ির পিছনে বিশাল বাগান। নানা রকমের গাছ আছে সেখানে। এগুলোর মধ্যে কিছু গাছ অনেক বড়। বাড়ির একপাশে বড় একটা পুকুরও আছে। সামনের দিকে বড় উঠোন। আজকালকার গ্রামের বাড়ি সাধারণত এত বড় হয় না।

বাড়ির সবচেয়ে বড় ঘরটাতে থাকে নিরু মেম্বার, তার স্ত্রী আর জরি। এ বড় ঘরের একটা কামরায় পরী আর জরি থাকত। মাঝারি আকৃতির অন্য ঘরটা কাচারী বা মেহমানদের ঘর। আর সবচেয়ে ছোট ঘরটাতে দুটো কামরা। একটাতে থাকে জয়নাল। অন্যটা ফাঁকা। ডাক্তার তরফদারকে মেহমানদের ঘরে বসতে দেয়া হলো। ভিতরটা বেশ সাজানো গোছান, সোফাও আছে। গ্রামের বাড়িতে সাধারণত সোফা থাকে না, চেয়ার থাকে। অথচ এই বাড়িতে আছে। তার জন্য যে কামরাটা বরাদ্ধ হলো সেখানে চেয়ার টেবিল থাকায় বেশ সুবিধা হলো ডাক্তার তরফদারের জন্য। তিনি আরামে লেখালেখির কাজগুলো করতে পারবেন। তিনি ঠিক করলেন এই বাড়িতে তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবেন এবং তার মূল কাজ হবে বাড়ির সবার কাছ থেকে পরী সম্পর্কে জানা।

প্রথমেই কথা বলতে শুরু করলেন নিরু মেম্বারের সাথে। নিরু মেম্বার মানুষটা ছোটখাট। শরীরের রঙ শ্যামলা। পরীর সাথে চেহারার কোনো মিল নেই। ডাক্তার তরফদার অনুমান করলেন পরী বোধহয় তার মায়ের চেহারাই পেয়েছে।

নিরু মেম্বার সামনে এসে বসতে ডাক্তার তরফদার বললেন, আপনি পরীর ছোটবেলা থেকে এখন পর্যন্ত সবকিছু খুলে বলবেন। তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি, প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আমার খুব প্রয়োজন।

কী প্রশ্ন স্যার?

আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, জন্মের সময় কী পরীর কোনো সমস্যা হয়েছিল? এই যেমন ধরুন শ্বাসকষ্ট, শরীরে কাঁপুনি কিংবা অন্যকিছু?

নিরু মেম্বার খুব স্বাভাবিকভাবে বললেন, না।

পরীর কী কখনও বড় ধরনের অসুখ হয়েছিল? এই যেমন ধরুন টাইফয়েড, টিটেনাস, ডিপথেরিয়া এরকম কিছু।

অনেকবার জ্বর হইছে, কিন্তু ঐ ধরনের বড় অসুখ হয় নাই।

ছোট বেলায় বা বড় হলে হঠাৎ কখনও অজ্ঞান হয়ে যেত?

না স্যার।

জীবনে কোনোকিছু দেখে ভয় পেয়েছিল? অথবা কোনোকিছুর প্রতি আতঙ্ক রয়েছে? যেমন, কুকুর, বিড়াল, রাতের অন্ধকার ইত্যাদি।

না।

কোনোকিছু তার অতিরিক্ত পছন্দের ছিল?

আমি সেইরকম কিছু মনে করতে পারতেছি না। তবে পরীর পড়ালেখার প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। মাঝে মইধ্যে কলেজের লাইব্রেরি থাইকা গল্পের বই আইনা পড়ত।

আর কোনো কিছুর প্রতি? কোনো বন্ধু বা বান্ধবী? ছবি আঁকা? খেলা?

বন্ধু থাকবে কীভাবে? আমি ওরে কড়া নজরে রাখতাম। তবে গ্রামের বান্ধবীরা আছে, ওগো সাথেও খুব একটা মিশত না। আসলে আমি মিশবার দিতাম না। পরী দ্যাখতে বেশি সুন্দর হওয়ায় আমিই কড়া শাসনে রাখতাম। ভয় পাইতাম বাড়ির বাইরা গ্যালে আবার অঘটন না ঘটায়। গ্রামের কয়েকটা ছেলে ওর পিছনে লাগছিল। রাইতে বাড়ির আশেপাশেও ঘোরাফেরা করত।

তারমানে বলা যায় পরী অধিকাংশ সময় বাড়িতেই থাকত।

জ্বি স্যার।

ঠিক আছে, এখন আপনি পরী সম্পর্কে বলুন। আপনার যা মনে আসবে তাই বলবেন। কোনো কিছু বাদ বা লুকিয়ে রাখবেন না। মনে রাখবেন পরীর চিকিৎসার জন্য আমার সবকিছু জানা খুব প্রয়োজন।

নিরু মেম্বার নড়েচড়ে বসে বলতে শুরু করল, পরীর জন্ম এই বাড়িতেই। পরী আমাদের বড় মেয়ে হওয়ায় ছোটবেলা থেকে পরী ছিল আদরের। ও আসলে খুব ভদ্র নম্র। ওকে নিয়ে কখনোও আমাদের বিরক্ত হতে হয়নি। বেশি আদরের ছিল বলে আসলে আমরা ওরে চোখে চোখে রাখতাম। পড়াশুনায় পরী ছিল খুব ভালো। ঘরের কাজ আর রান্নাবান্নাও শিখতে থাকে তাড়াতাড়ি। ক্লাস নাইনে উঠার পর থেকে আমি ভয় পেতে থাকি। কারণ ওর পিছনে উঠতি বয়সী ছেলেরা ঘুর ঘুর করতে থাকে। তখন থেকেই পরীকে নিয়া আমরা ভয়ে ছিলাম। যাইহোক, পরী এসএসসি পাস কইরা কলেজে ভর্তি হইল। তখন শুরু হইল আর এক যন্ত্রণা। কলেজের ছাত্ররা পরীকে যেমন বিরক্ত করতে লাগল, তেমনি একজনের পর একজন ঘটক আসতে লাগল। শ্যাষে পরীর কলেজে যাওয়া কমায় দিলাম। কিন্তু বিয়ার প্রস্তাব আসতেই লাগল। পরী রাজি হইত না। আমি চাইতেছিলাম পরীর বিয়া হইয়া যাক। তারপর পড়াশুনা করুক। কিন্তু পরী রাজি হয় নাই। পরে একদিন হঠাৎ পরীর মায়ের কাছ থাইকা শুনলাম পরী রাইতে বাইর হইয়া বাগানে ঘুরতেছে। তাতে আমি খুব ভয় পাই। পরীর মা মসজিদের হুজুরের কাছতে পানি পড়া আইনা খাওয়াইলেও কোনো কাজ হয় নাই। ঐ সময় আমি তাড়াহুড়া কইরা পরীরে বিয়া দিয়া দেই। শ্বশুড় বাড়ি

যাওয়ার সময় পরীরে জ্বীনে ধরে। পরে জব্বার ফকিররে দিয়া জ্বীন ছাড়াবার চেষ্টা করি। কিন্তু জামাই ওরে নিয়া যায়। তারপর তো আপনেই আসলেন।

ডাক্তার তরফদার ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আপনার হাতে অনেক পাত্র ছিল। ইমরানের থেকেও ভালো। সেক্ষেত্রে ইমরানের সাথে বিয়ে দিলেন কেন?

পরীর প্রতি আমার টান আছে, ওরে দূরে কোথাও বিয়া দিবার চাই নাই। কাছাকাছি রাখবার চাইছিলাম যেন পড়াশুনা করবার পারে। ইমরান ভালো পাত্র, বাড়িও বেশি দূরে না। আবার চাকরিও করে। তাই ওর সাথে বিয়া দিছি। তয় ইমরান যে পরীরে এত তাড়াতাড়ি ঢাকা নিয়া যাবে ভাবি নাই। এখন তো সব উল্টা পাল্টা হইয়া গেছে।

পরী কী বিয়েতে রাজি ছিল?

আসলে আমি অনেকটা জোর কইরাই বিয়া দিছি। আমার কোনো উপায় আছিল না। দুইটা কারণে আমি ভয়ে ছিলাম। প্রথম কারণ বখাটে ছেলেগো উৎপাত, আর দ্বিতীয় কারণ রাইতে পরীর বাগানে ঘুইরা বেড়ান।

কতদিন পরী বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছে?

দুই দিন।

আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

প্রথম দিন পরীর মা দ্যাখছে। পরীর দিনও হে প্রথমে দ্যাখছে। তারপর আমারে ডাইকা নিছে। তখনই সিদ্ধান্ত নিছি ওরে বিয়া দিব।

কিন্তু আপনি যে বললেন শ্বশুড় বাড়ি যাওয়ার সময় পরীকে জ্বীনে ধরেছে?

বিয়ার আগে পরী বাগানে ঘুরছে ঠিকই। কিন্তু ও অদ্ভুত আচরণ করে নাই, ওর শরীর কাঁপে নাই, নিচে পইড়া যায় নাই - এইগুলা সব জ্বীনে ধরার লক্ষণ। শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পর ঐ রাইতে ঐরকম হইছে। এইজন্য শ্বশুড় বাড়ি যাওয়ার সময় জ্বীনে ধরছে বইলা মনে হইছে।

বখাটে ছেলেদের আপনি ভয় পান কেন? আপনি তো গ্রামে খুব প্রভাশালী? আপনার কী কোনো শত্রু আছে?

ভয় পাওয়ার কারণ আছে। আমি যতই ক্ষমতাবন হই না কেন, যদি ওরা রাস্তাঘাটে পরীরে এসিড মারে, ওরে একবারের জন্য তুইলা নিয়া যায় - তাইলে আমি আমার ক্ষমতা দিয়া কী করব? আর শত্রুর কথা বলতেছেন। আছে, আমার শত্রু আছে। আসলে কার মনে কী আছে বোঝা মুশকিল। আমি মেম্বার মানুষ, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকেই। আর তাছাড়া বলতে লজ্জা নাই, আমি জমি বন্ধক রাখি। অনেকে টাকার অভাবে জমি ছাড়াবার পারে না। তারা আমার শত্রু হবারই পারে। একবার তো আমারে একজন রাইতে বটি হাতে আক্রমণ করছিল। তা প্রায় দশ বছর আগের কথা। কোনোমতে জানে রক্ষা পাই। তখন থাইকা জয়নালরে সাথে রাখা শুরু করি। গত দশ বছর ও আমার সাথে আছে।

ডাক্তার তরফদার নড়েচড়ে বসে বললেন, রাতে যখন পরী ঘরের বাইরে গিয়েছিল তখন বাগানের কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়েছিল নাকি সম্পূর্ণ বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছিল?

বলবার পারব না, আমি যেইদিন দেখছি বাগানে ঘুইরা বেড়াবার দেখছি। ঐ রাতের পর পরী যে কয়দিন এই বাড়ি আছিল বাইরার দরজায় ভিতর থাইকা তালা দিয়া রাখতাম যাতে ও বাইর হবার না পারে।

চাবি কার কাছে থাকত?

পরীর মায়ের কাছে।

পরী বাইরে যেতে চেষ্টা করেনি?

না করে নাই। নিজের ঘরে জরির সাথে ঘুমাইছে।

ডাক্তার তরফদার নিরু মেম্বারের সাথে আরও কিছু কথা বলে তার স্ত্রী এবং জরির সাথে কথা বললেন। নতুন তেমন কোনো তথ্য তিনি পেলেন না। এরপর ডাকলেন জয়নালকে। জয়নাল লম্বা বিশালদেহি এক মানুষ, হাতে একটা বাঁশ। জয়নাল সামনে দাঁড়াতে ডাক্তার তরফদার বললেন, আপনি তো অনেক দিন ধরে এই বাড়িতে আছেন?

হুঁ দশ বছর।

কি কাজ করেন আপনি?

আমি মেম্বারসাহেবরে পাহারা দেই, তার বাড়ি পাহারা দেই।

ও আচ্ছা, পরীর কী হয়েছিল?

জ্বীনে ধরছিল।

কতদিন আগে?

গত সপ্তাহে বিয়ার দিন, শ্বশুড় বাড়ি যাওয়ার সময়।

ডক্তার তরফদার এবার উঠে এসে বললেন, গত এক বছর ধরে এই বাড়িতে লম্বা সময় ধরে আর কে কে ছিল?

আমরাই ছিলাম। আর আছিল হাসান মাস্টার।

হাসান মাস্টার কোথায়?

বাড়ি গ্যাছে।

পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল কেন?

আমি জানি না। মেম্বার সাহেব বলবার পারবে।

হাসান মাস্টার মানুষ কেমন ছিল?

ভালো।

আপনার সাথে কথাবার্তা হতো?

হুঁ হইত।

যাওয়ার আগে আপনাকে কিছু বলে গেছে?

কহন গেছে আমি জানি না, কোনো কথাও হয় নাই।

আচ্ছা আপনি যান। প্রয়োজন হলে আপনার সাথে আবার কথা বলব।

জয়নাল চলে গেলে ডাক্তার তরফদার চেয়ারে বসে সবকিছু গভীরভাবে চিন্তা করলেন। তিনি ভেবেছিলেন তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত এই বাড়িতে থাকবেন। কিন্তু তিনি মত পাল্টালেন। তাকে এখন আরও একটা জায়গায় যেতে হবে, আর তা হলো হাসানের কলেজ ।

১৩

ইমরান অফিসে বসে আছে। গত একটা দিন তার ভালো কেটেছে। পরী খুব স্বাভাবিক ছিল। পরীর মধ্যে অনাকাঙ্খিত কোনো আচরণ দেখা যায়নি। বরং সমস্যাটা এখন তার নিজের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। একটু পর পর পরীকে ফোন করতে ইচ্ছে করছে। আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মোট চারবার সে ফোন করেছে। এখন আবার ফোন করতে ইচ্ছে করছে। নিজেকে অনেক কষ্ট করে দমিয়ে রেখেছে সে। এভাবে ফোনে কথা বললে ব্যাংকের চাকরি থাকবে না। সে লক্ষ্য করেছে তার ম্যানেজার তার উপর নজর রাখতে শুরু করেছে। সামনে দিয়ে দু'বার ঘুরেও গেছে।

ইমরান ভাবল যা হবার হবে, ম্যানেজার যা ভাবলে ভাববে। সে এখন আর একবার পরীর সাথে কথা বলবে। এরকম ভেবে সে যখন ফোন করতে যাবে তখন পরীই তাকে ফোন করল। ফোন ধরে হ্যালো বলতে ওপাশ থেকে ভারী একটা কণ্ঠস্বর বলল, কে বলছেন?

কণ্ঠস্বর শুনে ইমরানের রক্ত ঠান্ডা হয়ে আসার উপক্রম হলো। পরীর ফোন অন্য পুরুষের কাছে গেল কীভাবে? সে কাঁপা কণ্ঠে বলল, আমি ইমরান।

ইমরান সাহেব, আপনি এই ফোনের মালিককে চিনেন?

ইমরান তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি, আমার স্ত্রী।

আমি লালবাগ থানা থেকে বলছি। আপনি এখনই থানায় চলে আসুন। আপনার স্ত্রী থানায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ইমরানের মনে হলো তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এ সে কী শুনছে! সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, কী.. কী.. হয়েছে পরীর?

আপনার স্ত্রীর নাম পরী কিনা জানি না। তবে তার শারীরিক অবস্থা ভালো না। আমি সাব-ইন্সপেক্টর লোকমান। এসে আমার সাথে কথা বলুন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

ইমরান যে কীভাবে থানায় এসেছে বলতে পারবে না। জ্যামের কারণে এক কিলোমিটার পথ আসতে দু'বার রিকশা বদলেছে। তারপরও থানার কাছাকাছি আসতে তার সতের মিনিট সময় লেগেছে। কিন্তু একটা বিষয় সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। পরী থানায় এলো কীভাবে? তাহলে কী বাসায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে? সে যেন নার্ভাস না হয় এজন্য তাকে প্রাথমিকভাবে সাব-ইন্সপেক্টর লোকমান মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। কিন্তু কী দুর্ঘটনা ঘটবে? বাসায় করিম চাচা ছিল। বাইরে থেকে কারো ভিতরে ঢোকার কথা নয়। তাহলে কী হলো? মাথায় কিছুই ঢুকছে না ইমরানের। সে শুধু বুঝতে পারছে তার মাথা ভো ভো করে ঘুরছে এবং পরীকে না দেখে পর্যন্ত সে শান্ত হতে পারবে না।

থানায় এসে ইমরান দেখে পরী নেই। তাকে পাশের ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে ছুটল ক্লিনিকে। ক্লিনিকের ইমার্জেন্সিতে গিয়ে অবশেষে সে পরীর দেখা পেল। বেডের উপর আধ চোখ খোলা অবস্থায় পরী শুয়ে আছে। পাশে পুলিশের একজন মহিলা কনস্টবল দাঁড়ান। ইমরান তাড়াতাড়ি পরীর কাছে গিয়ে বলল, পরী, এ কি হয়েছে তোমার?

পরী কিছু বলতে পারল না। শুধু চোখ ঘুরিয়ে তাকাল। তারপর আবার আগের মতো পড়ে রইল।

পরীর পাশে যে কনস্টবল ছিল তার নাম রেহেনা। নেমপ্লেটে নাম লেখা আছে। রেহানা এগিয়ে এসে বলল, আপনার কী হয়?

ইমরান কাঁপা কণ্ঠে বলল, আমার স্ত্রী।

উনি খুব অসুস্থ, তাই না?

ইমরান ইতস্তত করে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না? কী হয়েছিল?

রেহানা পরীর দিকে ফিরে বলতে শুরু করল, আমি থানায় বসে কাজ করছিলাম। এমন সময় আপনার স্ত্রী এসে পৌঁছান। এসে বলেন, তিনি পুলিশকে গোপন কিছু কথা বলতে চান। আমি বললাম, কী কথা? উনি জানালেন ওসি স্যারকে বলবেন। ঐ সময় ওসি স্যার থানায় না থাকায় আমি তাকে ডিউটি অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর লোকমান স্যারের কাছে নিয়ে যাই। স্যার তাকে কথা বলার জন্য বললে তিনি তার কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি যেন বোবা হয়ে যান। তারপর আর কিছুই বলতে পারেন না। প্রথমে উনার মুখ কাঁপতে শুরু করে, তারপর হাত, তারপর সমস্ত শরীর। এরপর হঠাৎ করে নিচে পড়ে যান। আমরা তো ভয়ে মরি। এরপর এমনভাবে উনার হাত পা বেঁকে যেতে থাকে যে আমরা তাড়াতাড়ি ক্লিনিকে নিয়ে আসি। ডাক্তার বলেছে, আর কিছুক্ষণ দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যেত। উনার আত্মীয়-স্বজন কাউকে যে জানাব সেই উপায়ও ছিল না। কারো ঠিকানা জানা নেই। শেষে মোবাইল ফোনের মধ্যে আপনার নম্বরটা পেয়ে ফোন করা হয়েছে। আপনি এসেছেন ভালো হয়েছে, আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি।

আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন?

কষ্টের কিছু না। তবে ভয় পেয়েছি। থানা হাজতে কারো মৃত্যু হলে খুব ঝামেলা পোহাতে হয়, জানেন তো। আসলে কি অসুখ উনার?

আমি নিজেও জানি না। তবে আপনি যা বলেছেন এর আগে কয়েকবার হয়েছে।

আমার তো মনে হচ্ছে উনি মৃগী রুগী।

ইমরান লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, হতে পারে।

কোনো ডাক্তার দেখাননি?

হ্যাঁ দেখিয়েছে। ডাক্তার তরফদার তাকে দেখছেন। বলেছেন সুস্থ হয়ে উঠবে।

উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনাই করি। এখন তাহলে আসি।

কনস্টবল রেহানা চলে গেল। এরপর এলো ডাক্তার। ডাক্তার সবকিছু শুনে বলল, এখন উনি এখানে থাক। বিকেল পর্যন্ত আমরা অভজারভেশনে রাখি। তারপর বাসায় নিয়ে যাবেন।

ইমরান রাজি হলো। রাজি হওয়া ছাড়া তার আর কোনো বিকল্প নেই।

ঘন্টাখানেক পর স্বাভাবিক হয়ে এলো পরী। ইমরানের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সত্যি খুব লজ্জিত, তোমাকে খুব বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছি।

না না, লজ্জার কি আছে? বড় কোনোকিছু ঘটেনি, সেটাই ভাগ্য। তবে থানায় যদি তুমি আসতে চাইতে আমাকে নিয়ে আসতে, কিংবা করিম চাচাকে বলতে।

আমি করিম চাচাকে ডিম কিনতে পাঠিয়ে ইচ্ছে করে দূরে সরিয়ে দিয়েছি।

কেন?

আমি জানি না। আসলে আমার কী যে হয়, আমি...

থাক এসব নিয়ে ভেবে নো। এখন বিশ্রাম নাও। তোমার সুস্থ হতে বিশ্রামের প্রয়োজন।

আমি সুস্থ আছি। আমাকে বাসায় নিয়ে চলো।

ডাক্তার তোমাকে বিকেল পর্যন্ত এখানে থাকতে বলেছে।

আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমি বাসায় যাব।

এটা ঠিক হবে না।

আমার এখানে একটুও ভালো লাগছে না। বমি বমি আসছে। এখানে থাকলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব।

ইমরান বলল, ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করছি।

ইমরান পরীকে নিয়ে যখন হাসপাতাল থেকে বের হলো তখন দুপুর দুইটা। বাইরে বের হয়ে বলল, পরী, তোমার নিশ্চয় ক্ষুধা পেয়েছে।

পরী উপরে নিচে মাথা দুলাল।

চলো বাইরে কোথাও খাই। বিয়ের পর তোমাকে নিয়ে আমি কোথাও ঘুরিনি, কোথাও খাইনি।

পরী বলল, অনেক টাকা খরচ হবে।

হলে হবে। আজ আমি বেতন পেয়েছি। আমার কাছে টাকা আছে।

চলো যাই।

ভালো একটা রেস্টুরেন্টে খাবার খেল দুজন। খাওয়া শেষ হলে ইমরান বলল, পরী, সিনেমা দেখবে?

পরী বড় বড় চোখ করে বলল, সিনেমা!

হু সিনেমা। সিনেপ্লেক্সএ সিনেমা দেখব। ডিজিটাল সিনেমা হল।

ওখানে টিকেটের দাম কত?

আমি জানি না। আমি নিজেও আগে সিনেপ্লেক্স এ সিনেমা দেখিনি। চলো যাই। কী আছে জীবনে, দুজনে না হয় একটু আনন্দ করলাম।

সিনেপ্লেক্স এ দুটো টিকিট কাটতে পাঁচশ টাকা লাগল। এতে কিছুটা মন খারাপ হলো পরীর। ইমরান তাকে সাহস জুগিয়ে বলল, টাকা হচ্ছে আনন্দের জন্য, আজ আমাদের টাকা খরচ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি। তুমি পাচ্ছ না?

পরী দ্বিধাগ্রস্তভাবে মাথা দুলাল।

পপ কর্ন খেতে খেতে সিনেমা দেখে পরী তো মহাখুশী। ছবি দেখা শেষ হলে নিচে এসে ইমরান পরীর জন্য লাল রঙের একটা শাড়ী পছন্দ করল। শাড়ীটা পরীরও হলো। তবেদাম শুনে একেবারে চুপসে গেল সে, ছয় হাজার টাকা। এত দামী শাড়ী সে জীবনেও পরেনি। বলল, আমি শাড়ী কিনব না।

ইমরান অবশ্য জোর করে শাড়ীটা কিনে ফেলল।

রিকশায় বাসার কাছাকাছি আসতে ইমরান হঠাৎ শুনতে পেল পিছন থেকে কেউ তাকে ডাকছে। রিকশা থামিয়ে ফিরে তাকাতে দেখে টিভি ফ্রিজের দোকানের ম্যানেজার হাশমত ভাই। সে অবাক হয়ে বলল, হাশমত ভাই, আপনি! ক্যামন আছেন?

পাগলের বাড়ি থেকে বের হয়ে ভালো আছি। তুমি ক্যামন আছ?

ভালো আছি হাশমত ভাই।

তোমার সাথে উনি কে?

ইমরান তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, ও হচ্ছে পরী, আমার স্ত্রী। আর উনি হাশমত ভাই, আগে আমরা একসাথে থাকতাম, তোমাকে বলেছিলাম।

পরী সালাম দিতে হাশমত বলল, ইমরান, তোমার বউ তো দেখছি অসাধারণ সুন্দর। এরপর পরীর দিকে ফিরে বলল, ভাবী, আমি সবসময় বলতাম ইমরানের বউ হবে পরীর মতো সুন্দর এবং তাই হয়েছে।

পরী লাজুক হাসি হাসল।

এবার ইমরান বলল, হাশমত ভাই, বিয়েটা হঠাৎ হয়ে গেল। কোনো অনুষ্ঠান হয়নি। এজন্য কাউকে দাওয়াত করতে পারিনি।

আমি বুঝতে পেরেছি। পরে একসময় বাসায় দাওয়াত করে খাইয়ে দিও।

পরী খুব ভালো পায়েস রাঁধে। আপনার পায়েসের দাওয়াত রইল।

শুধু পায়েস খাওয়ালে হবে না, পোলাও মাংসও খাওয়াতে হবে। ঠিক আছে ভাবী?

হাশমতের কথায় পরী রাজি হয়ে মাথা দুলাল।

তাহলে তোমরা যাও। আমারও কাজ আছে, যেতে হবে।

ইমরান মনে করিয়ে দিয়ে বলল, হাশমত ভাই, বাসায় কিন্তু আপানার একটা ফ্রিজ আর টেলিভিশন আছে।

ওগুলো আর নিব না। তোমাদের বিয়ের গিফট্। তোমরা ব্যবহার করো।

ইমরান চোখ বড় বড় করে বলল, কী বলছেন হাশমত ভাই!

যা বললাম তাই সত্য। ওগোলো তোমাদের বিয়েতে গিফট্ করলাম। যাই, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। ফোন করে তোমাদের কাছ থেকে দাওয়াত নিয়ে নেব। আজ আসি।

হাশমত চলে গেলে আবার রিকশায় উঠল দুজন। ইমরান কিছুক্ষণ আগেও চিন্তিত ছিল। কারণ তার মাসের বেতন পুরোটাই প্রায় শেষ। পকেটে মাত্র ছয়শ টাকা আছে। তবে সে নিশ্চিত কোনো সমস্যা হবে না। কোনো না কোনো উপায়ে আবার তার পকেটে টাকা চলে আসবে। কারণ পরী আসার পর থেকে এরকম ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। তার কোনো বিপদ আর বিপদ থাকছে না, দ্রুত কেটে যাচ্ছে।

১৪

ডাক্তার তরফদার দুপুরে হাসানের কলেজে এসে পৌঁছালেন। হাসান ছিল বিএসসি এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। হাসানের এই তথ্য খুঁজে পেতে খুব একটা সমস্যা হয়নি ডাক্তার তরফদারের। কারণ হাসানের একটা পায়ে সমস্যা ছিল। এজন্য কলেজের সবাই তাকে চিনে। উপশহরের কলেজে ছাত্র বেশি থাকে না। এজন্য নাম বলতেই চিনে যায় সবাই। অবশ হাসানের ঠিকানা বের করতে গিয়ে ডাক্তার তরফদার পড়লেন মুশকিলে। তার কোনো বন্ধু-বান্ধবও তার ঠিকানা বলতে পারল না। সবাই জানাল, সে নিরু মেম্বারের বাড়িতে থাকে। কিন্তু হাসানের আসল বাড়ি কোথায় তা কেউ জানে না।

অবশেষে ডাক্তার তরফদার কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। ডাক্তার তরফদারের দুটো উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য হাসানের একটা পরীক্ষার খাতা জোগাড় করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হাসানের বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করা। প্রিন্সিপাল সাহেব অবশ্য নিজে কোনো তথ্য দিতে পারলেন না। তিনি ডাক্তার তরফদারকে জুনিয়র এক লেকচারের কাছে পাঠালেন। ঐ লেকচারার তাকে পরীক্ষার খাতার ফটোকপি দিলেও ঠিকানা দিতে পারল না। সে ঠিকানার জন্য ডাক্তার তরফদারকে পাঠাল এক কেরানির কাছে। অল্প বয়স্ক কেরানি ডাক্তার তরফদারকে দেখে খুবই বিরক্ত হলো। সাহায্য করার কোনো মানসিকতা তার নেই। প্রথমেই বলল, আগামীকাল আসেন।

ডাক্তার তরফদার বললেন, আগামীকাল আমি আসতে পারব না।

তাইলে পরশুদিন আসেন।

পরশুদিনও আমি আসতে পারব না।

কেরাণী বিরক্ত হয়ে বলল, সবকিছু তো আপনের ইচ্ছে মতো হবে না মশাই। আমার হাতে অনেক কাজ।

আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি কোনো কাজ করছেন না। শুধু কাজের ভান করছেন। তারপরও যদি ব্যস্ত থাকেন তাহলে আমি বসছি, আপনার যখন সময় হবে তখন ঠিকানা দিয়েন।

আপনে খোঁড়া মানুষের ঠিকানা দিয়া কি করবেন? আইজ কোনোভাবেই আমি পারব না। ভেজাল কইরেন না যান।

ডাক্তার তরফদার এবার একটু চালাকি করে বললেন, পরে কিন্তু আমার পিছনে দৌড়িয়েও কুল পাবেন না।

কেরানী চোখ কুচকে বলল, দৌড়ায় কুল পাব না মানে!

আপনি যদি আজ না দেন তাহলে আমি ঠিকই চলে যাব। কাল হয়তো আপনার সাথে আমার থানায় দেখা হবে।

থানার কথা শুনে সোজা হয়ে বসল কেরানী। চোখ বড় বড় করে বলল, থানায় দেখা হবে মানে?

ডাক্তার তরফদার এবার তুমি সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের কলেজ থেকে একটা ছেলে হঠাৎ নিখোঁজ। এই নিখোঁজ বিষয়ে তদন্ত করতে এলে তুমি আমাকে অসহযোগিতা করছ। এতে কী প্রমাণিত হয় না যে ঐ ছেলের নিখোঁজ হওয়ার সাথে তোমার সম্পৃক্ততা আছে?

কী বলছেন আপনি?

আমি কিছু বলছি না। তবে আমি জানি ত্যাদরকে কীভাবে সোজা করতে হয়। যাই তাহলে, তুমি ঠিকানাটা বের করে থানায় দিয়ে এসো। ঐখানেই তোমার সাথে আমার দেখা হবে।

কথাগুলো বলে ডাক্তার তরফদার উঠে যাচ্ছিল। কিন্তু কেরানী নিজেই তার আগে লাফ দিয়ে উঠে বলল, স্যার আমার ভুল হইছে, আমি এখনই আপনার যা যা লাগবে সব বাইর কইরা দিতেছে, বসেন স্যার, বসেন।

ডাক্তার তরফদার গম্ভীর হয়ে বসে থাকলেন। হাসান কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় যে ফরম জমা দিয়েছিল কেরানী সেই ফরমের একটা ফটোকপি এনে দিল ডাক্তার তরফদারকে। সময় বেশি লাগল না, মাত্র পনের মিনিট।

ডাক্তার তরফদার ফরমটার ফটোকপির উপর চোখ বুলিয়ে খুব বিস্মিত হলেন। ফরমের ঠিকানার জায়গা লেখা 'মাদারীপুর দরবার এতিম খানা'। আর অভিভাবকের জায়গায় নাম লেখা, আবুল কাশেম, পাশে মোবাইল নম্বর।

ডাক্তার তরফদার বাইরে এসে আবুল কাশেমকে ফোন করলেন। কেন যেন তার মনে হচ্ছিল ওপাশে কেউ ফোন ধরবে না। কিন্তু ফোনটা ধরল। মনে হলো বয়স্ক কারো গলা। কারন টানা আর কাঁপা গলায় বলতে শোনা গেল, হ্যালো?

ডাক্তার তরফদার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনে হাসানকে চিনেন?

হঁ চিনি, বাবা।

আমি হাসানকে খুঁজছিলাম। ও কোথায়?

হাসান তো তিন মাস আগে এতিমখানায় আইছিল। তিন দিন আছিল। তারপর আর আসে নাই। মাঝে মইধ্যে আমার খোঁজ খবর নিত। মাস দেড়েক হইল কোনো ফোন পাই না।

হাসানের বাবা মা কোথায়?

ওর তো বাপ মা নাই, বাবা। ও ছোডবেলা থাইকা এই এতিমখানায় আছিল। ওরে আমরা হাসপাতালে পাই। তহন বয়স কত হবে, তিন বছর। তারপর থেকে আমার কাছেই আছিল। আমারেই বাপের মতো শ্রদ্ধা করত। আমার একটা ছোট এতিমখানা আছে, কষ্ট কইরা চালাই। এই এতমিখানায়ই বড় হইছে হাসান। কিন্তু কয়দিন হইল ওর কোনো খবর পাইতেছি না। ভাবতেছি যে বাড়িতে থাইকা পড়াশুনা করত, ঐ বাড়িতে একবার যাব। কিন্তু শরীরে কুলায় না। আপনের সাথে কি ওর দেখা হবে?

জানি না হবে কিনা? আমি নিজেই ওকে খুঁজছি। দেখা হলে কিছু বলব?

বলবেন আমারে যেন একবার দেইখা যায়। আমার শরীরডা ভালো না। এতদিন কষ্ট কইরা এতিমখানা চালাইছি, এইখানে শিক্ষকতা করছি। এখন আর পারতেছি না। ভাবছিলাম পড়াশুনা শেষ হইলে হাসানরে দায়িত্বডা দিব। ওই হবে এতিমখানার শিক্ষক। আমার জায়গাডা নিবে, কিন্তু কোথায় যে গেল!

আমার সাথে দেখা হলে হাসানকে বলব যেন আপনার সাথে দেখা করে।

ঠিক আছে বাবা।

এরপর লাইন কেটে গেল। ডাক্তার তরফদার খুব চিন্তায় পড়লেন। তিনি ভেবেছিলেন কি আর হচ্ছে কী? মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ধীরে ধীরে ঘোলাটে হচ্ছে। যুক্তিগুলো ঠিক মিলছে না। মিলছে না বলেই মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে। তাই আর দাঁড়ালেন না তিনি। রওনা দিলেন গ্রামের মসজিদের উদ্দেশ্যে।

ডাক্তার তরফদার একবেলাও নিরু মেম্বারের বাড়ি খাবার খাননি। এজন্য রাতে নিরু মেম্বার নিজে এসে ডাক্তার তরফদারকে বাড়ি নিয়ে গেল। সাথে ইমাম সাহেবও গেল। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে নিরু মেম্বার খানিকটা কৌতূহলী হয়ে বলল, স্যার, আমি বুঝতে পারতেছি না আপনে কীভাবে পরীর চিকিৎসা করতেছেন। পরী ঢাকায় আর আপনে এইখানে। সারা জীবন দেখলাম চিকিৎসার সময় ডাক্তারের রুগীর কাছে থাকতে হয়। আর আপনে আইছেন দূরে।

ডাক্তার তরফদার মৃদু হেসে বললেন, এটা ভিন্ন ধরনের অসুখ। এজন্য এত দূরে এসেছি।

কিছু বুঝবার পারছেন স্যার? আসলেই জ্বীনের কারবার, নাকি অন্যকিছু।

আপনার কী মনে হয়?

আমি জানি না, আমার মাথা ঠিক নাই। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করি।

ডাক্তার তরফদার এবার সরাসরি নিরু মেম্বারের চোখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আপনি আমাকে অনেককিছু বলেছেন কিন্তু একটা কথা বলেননি?

কী কথা?

হাসানের কথাটা। আপনাদের বাড়িতে হাসান ছিল। ঐ প্রসঙ্গটা আপনি আমার সামনে প্রকাশ করেন নি। কেন?

ডাক্তার তরফদার ভেবেছিলেন হাসানের কথা শুনে নিরু মেম্বার চমকে উঠবে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। বরং খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, স্যার কী বলব! এই সব কথা কী বলা যায়! পরী আমার মেয়ে, দ্যাখতেও পরীর মতো সুন্দর। অথচ ঐ সুন্দর মেয়েডার উপর নজর পড়ছিল হাসানের। ভুলায় ভালায় সম্পর্ক করবার চাইছিল পরীর সাথে। বুঝবার পাইরা আমি হাসানরে বাকঝকা করি। কিন্তু হাসান শুনে নাই। পরে আমার ভয় হইত আবার পলায় না যায়। শ্যাষে হাসানরে বাড়ি ছাইড়া দিবার বলি। ও চাইলা যায়। এই সম্পর্কের কথাডা আপনেরে বলি ক্যামনে? আপনে আমার জামাইয়ের পাঠান ডাক্তার। ফিরা যাইয়া যদি জামাইরে বইলা দ্যান পরীর আগে প্রেম আছিল তাইলে পরীর কী অবস্থা হবে নিশ্চয় বুঝবার পারতেছেন। এই ভয়ে বলি নাই, অন্য সবাইরেও বলবার নিষেধ করছি। যদি হাসান সম্পর্কে আপনের কিছু জানবার ইচ্ছা হয় জিজ্ঞেস করেন সব বলব। তাতে যদি পরী সুস্থ হয় ঐডাই আমার পাওয়া।

আপনার উচিত ছিল হাসানের সাথে পরীর বিয়ে দেয়া।

কীভাবে দিব? আমি তো সমাজে বাস করি। এতিম খোঁড়া এক ছেলের সাথে পরীরে বিয়া দেই ক্যামনে। কোনো বাপ কি তার মেয়েরে খোঁড়া ফকির ছেলের সাথে বিয়া দিবে? বলেন স্যার বলেন?

ডাক্তার তরফদার এবার সরাসরি নিরু মেম্বারের চোখে তাকিয়ে বলল, হাসান কোথায় গেছে? আপনি কি জানেন?

না জানি না। আমারে কিছু বলে নাই। রাইতের অন্ধকারে চইলা গেছে।

বই খাতা, জামা-কাপড় এগুলো কোথায়?

সব নিয়া গেছে। আসলে ও ছিল একটা লোভী। আমি বুঝবার পারি নাই। যখন বুঝছি অনেক দেরি হইয়া গেছে।

হাসান চলে যাওয়ার পর কি ঐ ঘরে কেউ ছিল?

না কেউ ছিল না।

আমি কি হাসানের ঘরটা দেখতে পারি?

অবশ্যই দেখবার পারেন।

ডাক্তার তরফদার হাসানের ঘরটা দেখলেন। লাঠিয়াল জয়নাল যে ঘরে থাকে তার সংলগ্ন ঘরটাই হাসানের ছিল। দুটো ঘরের মাঝের বেড়ায় একটা দরজা আছে। দরজাটা জয়নালের পাশ থেকে বন্ধ। হাসানের ঘরের ভিতরে কিছু নেই। একেবারে ফাঁকা। পুরাতন বই খাতা, জামা-কাপড় এমন কি এক টুকরো কাগজ পর্যন্ত নেই।

ডক্তার তরফদার এরপর ঢুকলেন পরীর ঘরে। পরীর যতগুলো খাতা ছিল সবগুলো নিয়ে তিনি মসজিদে চলে এলেন। যদিও তার খুব ঘুম পাচ্ছে, সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি আর ঘুমাবেন না। রাতে যত কষ্টই হোক সবকিছু বিশ্লেষণ করে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন। হাসানকে তার পেতেই হবে। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন হাসানকে ছাড়া তিনি পরীকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন না।

ডাক্তার তরফদার খুব মনোযোগের সাথে পরীর খাতাগুলো পরীক্ষা করছেন। যা আশা করছিলেন সেরকমই হচ্ছে সবকিছু। কিছু কিছু লেখা কেটে উপরে অন্য একজন লিখেছে। বোঝা যাচ্ছে এটা হাসানের লেখা। কারণ কলেজ থেকে নিয়ে আসা খাতা, পরীর খাতার লেখা এবং পরীর ব্যাগে পাওয়া চিঠির লেখা একই। পরীকে যে চিঠি লিখত সে হাসান কিনা তা নিশ্চিত হওয়া খুব প্রয়োজন ছিল ডাক্তার তরফদারের জন্য। এখন তিনি নিশ্চিত হয়েছেন। এরপর তিনি সময় নিয়ে পরীর অসুস্থতার বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। বিশ্লেষণে তিনি দেখলেন বেশ কয়েকটি কারণে পরী অসুস্থ হতে পারে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

প্রথম কারণ, পরীর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাওয়া। পরী পড়াশুনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জন্য সে কলেজে যেতে পারত না। এটা তার জন্য মানসিক একটা চাপের কারণ হতে পারে যার জন্য সে অসুস্থ হয়েছে। কিন্তু যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য নয় এ কারণে যে পরীর বাড়িতে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং মাঝে মাঝে সে কলেজে যেত। কলেজে যেতে না পারার কারণে সে যদি অসুস্থ হতো তাহলে সে আরও আগে অসুস্থ হতো। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় পর লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে এক্ষেত্রে সেরকম হতে পারে বলে মনে হচ্ছে না। কাজেই পড়াশুনার কারণে পরী অসুস্থ হয়েছে ব্যাপারটা গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না।

দ্বিতীয় কারণ, পরীর সাথে হাসানের একটা সম্পর্ক হয়েছিল। সেই সম্পর্কটা পছন্দ করত না নিরু মেম্বার। কারণ হাসান এতিম এবং একটা পা অন্য পা থেকে ছোট ছিল। নিরু মেম্বার চাইত না সম্পর্কটা টিকে থাকুক। এই কারণে একটা ত্রিমূখী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে ছিল হাসানের প্রতি পরীর দুর্বলতা, হাসানের পারিবারিক ও শারীরিক অক্ষমতা এবং নিরু মেম্বারের অসম্মতি। এই দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ চাপটা ধীরে ধীরে পরীর উপর এসে পড়তে থাকে। পরী চাপটা সহ্য করতে না পারায় একসময় সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়ে।

তৃতীয় কারণ, পরীর উপর উপর্যুপরী বিয়ের চাপ। পরী বিয়ে করতে চাচ্ছিল না। কিন্তু নিরু মেম্বার পরীর বিয়ে দিয়ে দিতে চাচ্ছিল। কারণ পরীর অনেক ভালো ভালো প্রস্তাব আসছিল। ঐ মুহূর্তে পরী হাসানের প্রতি দুর্বল থাকায় সে বিয়েতে রাজি হচ্ছিল না, আবার তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাবে - সেই বিষয়েও আশঙ্কিত ছিল সে। একদিন তার সত্যি অজানা অচেনা ইমরানের সাথে হঠাৎ বিয়ে হয়ে যায়। এতে সে খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যা তার মনের উপর আকস্মিক এক তীব্র মানসিক চাপের সৃষ্টি করে। তার অপরিণত বয়স ঐ চাপটা সহ্য করতে পারেনি। এজন্য সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবশ্য কারণটা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পরীর মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল বিয়ের আগে। কাজেই বিয়ে যে এককভাবে পরীর অসুস্থতার কারণ সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়।

চতুর্থ কারণ, পরী অধিকাংশ সময় তার বাড়িতেই কাটাত। বখাটে ছেলেদের ভয়ে বাড়ি থেকে খুব একটা বের হতো না। ফলে তার চিন্তভাবনার গন্ডিটা ছোট হয়ে পড়ে এবং বাইরের পৃথিবীর প্রতি তার একটা ভয়ের সৃষ্টি হয়। অথচ তার মতো বয়সের একজন মেয়ের অবশ্যই বান্ধবীদের সাথে আড্ডা দেয়া, কথা বলা, হাসাহাসি করার কথা। কিন্তু সে সেটা করতে চাইলেও কারতে পারছিল না। এই চাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্ব তার মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। অবশ্য এই কারণটা খুব দুর্বল বলে পরীর অসুস্থতার মূল কারণ বলে মেনে নেয়া কঠিন ।

আরও কিছু ছোট-খাট কারণ বিশ্লেষণ করার পর ডাক্তার তরফদারের কাছে দ্বিতীয় কারণটাকেই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হলো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে হাসান চলে গেল কেন? নিশ্চয় নিরু মেম্বার তাকে কিছু বলেছে এবং তার ভয়ে সে চলে গেছে। সত্যি যদি চলে যায় সেক্ষেত্রে কী পরীকে তার বলে যাওয়া উচিত ছিল না? হয়তো ছিল, কিন্তু সাহসে কুলায়নি। হাসান যদি চলে যায় তাহলে কোথায় যাবে? অবশ্যই এতিম খানায়। কিন্তু এতিম খানায় সে যায়নি। সবকিছু বিবেচনা করে এরকম মনে হচ্ছে যে, নিরু মেম্বার মোটা অংকের টাকা দিয়ে হাসানকে দূরে কোথাও চলে যেতে বলেছে। এত দূরে যে সেখান থেকে সে আর আসবে না। সেখানে সে কলেজে নতুনভাবে ভর্তি হবে এবং পরীর কাছে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। এটা হওয়া খুবই যুক্তিসংগত। কিন্তু হাসানের যে চরিত্র তাতে সে যে টাকা নিয়ে চলে যাবে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার যদি গিয়েও থাকে সেক্ষেত্রে কলেজ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে যাওয়ার কথা। তার পিতৃসমতুল্য শিক্ষক আবুল কাশেমকে ফোন করার কথা। কিন্তু সে ফোন করছে না।

নিরু মেম্বার মানুষটা কেমন এবার বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন ডাক্তার তরফদার। নিরু মেম্বারকে খুব স্বাভাবিক মানুষ বলেই তার মনে হয়েছে। পরীসহ পরিবারের প্রতি তার যথেষ্ট টান রয়েছে। গ্রামে অন্যান্য মেম্বারের যেমন বদনাম তার বদনাম অতটা না। সে যথেষ্ট যৌক্তিক মানুষ। পরী সম্পর্কে বলার সময় হাসানের প্রসঙ্গ বাদ দেয়ায় তার কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু পরে যুক্তি দিয়ে নিরু মেম্বার সবকিছু সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এটাই সত্য যে কোনো বাবা-মা চাইবে না তার মেয়ে একজন এতিম আর খোঁড়া ছেলেকে বিয়ে করুক। এই যুক্তিতে যদি সে হাসানকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে থাকে তাহলে অযৌক্তিক কিছু করেনি বলেই অনুমেয় হয়। সেক্ষেত্রে হাসানের চলে যাওয়ার বিষয়ে নিরু মেম্বারকে দোষ দেয়া যাবে না।

বাকী যাদের বক্তব্য তিনি নিয়েছেন সবাইকে তার সাধারণ মানুষ বলেই মনে হয়েছে। পরীর মা, বোন জরি, মসজিদের ইমাম, জয়নাল সবাই স্বাভাবিক। কারো আচরণে বা কথাবার্তায় অস্বাভাবিক কোনোকিছু ধরা পড়েনি। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে হাসান কোথায়? হাসান কি নিজে থেকেই পালিয়ে গেল? ভয়ংকর একটা বিষয় ঘটলেও ঘটতে পারে। ব্যাপারটা যদি এমন হয় যে, হাসান আর পরীর মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল এবং পরী গর্ভবর্তী হয়েছে, তাহলে কী ঘটবে? হাসান ব্যাপারটা জেনে নিজেই চলে গেছে। কিন্তু সেটা সত্য না। কারণ নিরু মেম্বার হাসানকে চলে যেতে বলেছে। পরী গর্ভবতী জেনেও কী নিরু মেম্বার হাসানকে চলে যেতে বলবে? বলতে পারে। কারণ নিরু মেম্বার কোনোভাবেই হাসানকে মেনে নিতে পারছিল না। এটা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে এজন্য যে অতি দ্রুত সে পরীর বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। হাসানও বড় একটা ঝামেলা থেকে বেঁচে গেছে। এজন্য সে অনেক দূরে চলে গেছে, হয়তো দুই তিন মাস পর কলেজে আসবে। তখন তাকে কলেজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটা অনেক লম্বা সময় এবং হাসানকে পাওয়ার জন্য অত লম্বা সময় অপেক্ষা করা যাবে না। তাহলে পরীকে বাঁচিয়ে রাখা কষ্ট হবে। কারণ পরীর অসুস্থটা ধীরে ধীরে প্রকট আকার ধারণ করছে। অবশ্য হাসান আর পরীর শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারটা যে সত্য নয় সেটা বুঝতে পারছেন ডাক্তার তরফদার। এজন্য সমাধান খুঁজতে খুঁজতে আবার তিনি গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাচ্ছেন।

ডাক্তার তরফদার বুঝলেন এখন তার একমাত্র কাজ হবে হাসানকে খুঁজে বের করা। হাসানকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত সকল রহস্য উম্মোচিত হবে না, পরীকে সুস্থ করা যাবে না। খুব সাধারণভাবে চিন্তা করলে ব্যাখ্যাটা এরকম দাড়ায় যে, পরী আর হাসান একে অন্যকে

ভালোবাসত। নিরু মেম্বারের ভয়ে হাসান বাড়ি থেকে দূরে কোথাও চলে গেছে। তারপর পরীকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে পরী ভয়ানক মানসিক আঘাত পেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। এখন হাসানকে খুঁজে বের করে পরীকে আবার হাসানের কাছে ফিরিয়ে দিলে পরী সুস্থ হয়ে উঠবে। এজন্য হাসানকে খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে জরুরী।

ডাক্তার তরফদার ঘড়ি দেখলেন। রাত দুটো বাজে। তিনি হাই তুললেন। বুঝতে পারলেন তার ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না। কারণ তিনি এখনও সমাধান খুঁজে পাননি। সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত তিনি শান্তি পাবেন না। তাই তিনি আবার প্রথম থেকে সকল তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। হঠাৎ কী মনে হতে তিনি ইমরানকে ফোন করলেন। যদিও তিনি বুঝতে পারছিলেন এত রাতে তার ফোন করা তার উচিত না, তারপরও তিনি করলেন।

ওপাশ থেক ইমরান ফোন ধরে বলল, স্যার আপনি ফোন করে ভালোই করেছেন। আমিই আপনাকে ফোন করতাম।

কেন?

আজ রাতেও ঐ একই কান্ড ঘটেছে।

কী কান্ড?

পরী বাগানের মধ্যে চালতা গাছের চারপাশে হাঁটছে আর কি যেন খুঁজছে। আমার খুব ভয় করছে স্যার।

ভয়ের কোনো কারণ নেই। ঐদিন দুপুরে থানায় যাওয়ার বিষয়টা ভয়ের ছিল। কারণ পরী ঢাকা শহর চিনে না। কিন্তু আমার বাড়ি ওর জন্য নিরাপদ। তুমি ওকে বাঁধা দিও না। যখন ক্লান্ত হয়ে নিচে পড়ে যাবে তখন রুমে নিয়ে এসো।

ঠিক আছে স্যার।

করিম আছে না বাড়িতে?

জ্বি স্যার আছে।

করিম খুব ভালো মানুষ। ওকে সাথে রেখো। আর একেবারে বাইরের গেটটা তালা দিয়ে রেখো যেন পরী বাইরে যেতে না পারে। যা কিছু করার ভিতরেই করুক।

ঠিক আছে স্যার।

আর কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানিও।

আচ্ছা স্যার।

লাইন কেটে দিলে ডাক্তার তরফদার নিজের মধ্যে কেমন যেন প্রশান্তি অনুভব করলেন। তারপর চোখ বুঝতে হারিয়ে গেলেন গভীর ঘুমে।

১৬

ডাক্তার তরফদার রাতে লম্বা একটা ঘুম দিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠতে নয়টা বেজে গেল। নাস্তা শেষে ইমাম সাহেবকে ডেকে বললেন, আমি আজ চলে যাব।

ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এত তাড়াতাড়ি? আপনার কাজ শেষ?

এখনও শেষ হয়নি। অমি চলে যাওয়ার আগে আর একবার নিরু মেম্বারের বাড়ি যেতে চাই।

কখন যাবেন?

এখনই।

আজ ইউনিয়ন পরিষদের সভা আছে। নিরু মেম্বার বাড়ি থাকবে না বলে মনে হয়।

আমার তাকে প্রয়োজন নেই। আমি যাব, বাড়িতে কয়েকটা জায়গা ঘুরব, চলে আসব। আপনাকেও আমার সাথে যেতে হবে।

আপনি চাইলে অবশ্যই যাব।

নাস্তা শেষে ডাক্তার তরফদার ইমাম সাহেবকে নিয়ে নিরু মেম্বারের বাড়িতে এলেন। নিরু মেম্বার বাড়িতে ছিল না। জরিকে নিয়ে তিনি বাড়ির পিছনে এলেন। তারপর বললেন, জরি, তোমাদের এই বাগানটা কত বড়?

জরি বলল, অনেক বড় স্যার।

এই বাগানে তোমরা ছাড়া আর কে আসে?

কেউ আসে না। পুরো বাড়ি তারকাটার বেড়া দিয়ে ঘেরা। মানুষ আসবে কীভাবে?

তারমানে বাগানটায় যারা ঘুরাফেরা করে তারা এই বাড়ির মানুষ। কে সবচেয়ে বেশি আসে?

এখন কেউ আসে না। পরী আপা আর আমি মাঝে মইধ্যে এই বাগানে আসতাম। পরী আপা চলে যাওয়ার পর আমিও আসি না। ভয় ভয় করে।

ডাক্তার তরফদার জরির চোখে তাকিয়ে বললেন, ভয় করে কেন?

আপার মতো যদি আমাকেও জ্বীনে ধরে, এইজন্য।

তোমার আপাকে কি সত্যি জ্বীনে ধরেছিল?

হ্যাঁ, জ্বীনে ধরেছিল।

ডাক্তার তরফদার ধীরে ধীরে বাগানের ভিতরের দিকে প্রবেশ করতে থাকলেন। বাগানে নানা ধরনের ফল আর কাঠের গাছ। বেশিরভাগ গাছই অনেক পুরাতন। বয়স ত্রিশ চল্লিশ বছরের কম হবে না। একটা তেতুল গাছ দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তার ধারণা, গাছটার বয়স একশ বছর হবে। এত বড় তেতুল গাছ তিনি জীবনে দেখেছেন কিনা মনে করতে পারলেন না।

বাগানের আরও ভিতরে ঢুকে ডাক্তার তরফদার জরিকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাড়িতে বাজার করে কে?

এখন বাবাই করে। আগে হাসান স্যার করত।

আর কি কাজ করত তোমার হাসান স্যার?

আমাদের পড়াত, উপজেলায় কোনো কাজ থাকলে করত।

কী রকম কাজ?

সারের দাম কতো জানা, বীজের দাম কতো, স্ট্যাম্পের দাম কত এইরকম কাজ। মাঝে মাঝে চেয়ারম্যান বাড়িতে কাজ থাকলে সেখানেও যেত। তবে খুব কম।

ডাক্তার হাসান ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, তোমার হাসান স্যার কি তোমাকে আদর করত?

হ্যাঁ করত। খুব আদর করত। মাঝে মধ্যে চকলেট, আইসক্রিম কিনে দিত।

তোমাদের পড়াত কোথায়?

আপার ঘরে। আমরা দুইজনে ঐখানে পড়তাম।

খাওয়া দাওয়া করত কোথায়?

তার ঘরে। বাড়িতে যে রহিমা খালা আছে সেই খাবার দিত। জয়নাল কাকা আর হাসান স্যারকে একই সাথে খাবার দিত।

তোমরা কখনও খাবার দিতে না?

খুব কম। তবে মাঝে মধ্যে পরী আপা এইটা ঐটা দিত। একবার বাবা দেখে খুব বকেছিল। তারপর আর দিত না।

তুমি খুব সুন্দরভাবে কথা বলছ। কে শিখিয়েছে?

হাসান স্যার।

এবার ইমাম সাহেব বললেন, আর কতদূর যাবেন?

ডাক্তার তরফদার কোনো উত্তর দিলেন না। চারদিকের গাছগুলোর দিকে তাকালেন। তারপর ডেকে উঠে বললেন, জরি?

জি স্যার।

তোমাদের বাগানে কোনো চালতা গাছ আছে?

আছে স্যার।

কোথায়?

বাগানের একেবারে পিছনে। ঐ চালতা গাছের পরেই বিল শুরু হয়েছে। এইজন্য ভয়ে ঐদিকে কেউ যায় না।

আমি ঐ চালতা গাছের কাছে যেতে চাই, তুমি নিয়ে যাবে?

চলেন।

চালতা গাছটা বাগানের একেবারে শেষ মাথায়। বয়সও অনেক। গাছের অনেক ডাল মরে গেছে। পাতা শূন্য ডালগুলো উপরের দিকে খাঁড়া খাঁড়া হয়ে আছে। যে অল্পকিছু পাতা গাছের ডালগুলোতে আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় গাছটার বেঁচে থাকার জন্য অপর্যাপ্ত। এজন্য গাছটাকে দেখলে কেমন ভয় ভয় করে। রাতে এখানে মানুষ এলে ভয়েই মরে যাবেব। এরকম ভয় উপেক্ষা করে যে আসে সে এক অজানা আকর্ষণে আসে। কী সেই আকর্ষণ? প্রশ্নটা নিজেই নিজেকে করলেন ডাক্তার তরফদার। কারণ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলে তিনি পরীকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন বলে বিশ্বাস করছেন।

চালতা গাছটার ওপাশে তারকাটার বেড়া, তার ওপাশে বিশাল বেতঝোপ, তারপর শুরু হয়েছে বিল। ডাক্তার তরফদার চালতা গাছের চারপাশটা খুব ভলোমতো লক্ষ্য করলেন। যা ভেবেছিলেন তাই। সবজায়গায় কম বেশি পুরাতন ঘাস থাকলেও একজায়গার ঘাস একেবারে নতুন। জায়গাটা ছোট। তবে একজন মানুষকে সহজেই মাটিচাপা দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

ডাক্তার তরফদার ইমাম সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইমাম সাহেব, এই যে নতুন ঘাসওয়ালা মাটিটুকু দেখতে পাচ্ছেন এর নিচে হাসানকে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে।

ইমাম সাহেব চোখ বড় বড় করে বললেন, কী বলছেন আপনি! কে করল সর্বনাশা কাজটা!

ডাক্তার তরফদার বিড় বিড় করে বললেন, আমি আবুল কাশেম নামের এতিমখানার এক শিক্ষকের নম্বর আপনাকে দেব। আপনি তাকে ফোন করে ব্যাপারটা জানাবেন। আর বলবেন সে যেন এসে একটা খুনের মামলা করে।

ডাক্তার তরফদার এরপর ধীরে পায়ে নিরু মেম্বারের বাড়ি থেকে বের হয়ে এলেন।

১৭

ডাক্তার তরফদার ঢাকা ফিরে এলেন দুপুরের পর। ঢাকায় ফিরে তিনি লম্বা একটা ঘুম দিলেন। রাত সাড়ে নয়টার দিকে তিনি যখন তার পড়ার কক্ষে এসে বসলেন তখনই ইমরান উদভ্রান্তের মতো ছুটে এলো। আজ সে ভিতরে ঢুকার সময় অনুমতিও নেয়নি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, স্যার সর্বনাশ হয়ে গেছে!

কী হয়েছে?

পুলিশ পরীর বাবাকে গ্রেফতার করেছে। সাথে তাদের বাড়ির লাঠিয়াল জয়নালকে।

কেন?

আমি বিস্তারিত জানি না। পরীর মা পরীকে ফোন করেছিল। সে জানিয়েছে পরীর বাবা আর জয়নাল নাকি হাসান মাস্টারকে খুন করেছে। হাসান যে এতিমখানায় বড় হয়েছে তার শিক্ষক আবুল কাশেম পরীর বাবা নিরু মেম্বারের নামে খুনের মামলা করেছে। পরীদের বাড়িতে বাগানের একেবারে শেষ মাথায় চালতা গাছের নিচে লাশটা পাওয়া গেছে। পাশে আর একটা গর্তে বই, খাতা, জামা কাপড় সবকিছু ছিল।

পরী কী করছে?

পরী বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

ওকে কাঁদতে দাও। কাঁদার সময় ওর কাছে যেও না। কান্নাটা পরীর জন্য খুব প্রয়োজন। যতক্ষণ ইচ্ছে কাঁদুক, যতদিন ইচ্ছে কাঁদুক।

কি....কিন্তু স্যার।

কোনো কিন্তু নয়। যা সত্য তাই হয়েছে। নিরু মেম্বার খুন করেছে এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এটা অন্য কিছু নয়।

পরী আমাকে বলল আপনি নাকি গিয়ে হাসানের লাশ যেখানে পুতে রাখা হয়েছিল সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছেন। পরীর মা পরীকে ফোনে বলেছে। আমি বুঝতে পারছি না পরীর বাবা হাসানকে খুন করবে কেন?

ডাক্তার তরফদার ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমিও ভাবিনি নিরু মেম্বার হাসানকে খুন করতে পারে। আমার প্রথমিক ধারণা ছিল হাসান সত্যি গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু এরপর যখন জানতে পারি এতিমখানার শিক্ষক আবুল কাশেমের সাথে হাসানের প্রায় দেড় মাস ধরে কোনো যোগাযোগ নেই তখনই সন্দেহটা মাথায় ঢুকে। আগেও সন্দেহটা ছিল তবে অতটা প্রকট ছিল না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন নিরু মেম্বার হাসানকে খুন করবে। উত্তরটা একেবারে সাধারন। নিরু মেম্বার চায়নি পরীর সাথে হাসানের বিয়ে হোক। কারণ কোনো বাবা-মাই চাইবে না একটা এতিম খোঁড়া ছেলের সাথে তার মেয়ের বিয়ে হোক। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিরু মেম্বার হাসানকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারেনি। কারণ ততদিন হাসান আর পরীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক হয়ে গেছে। নিরু মেম্বার ইচ্ছে করলে হাসানকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলতে পারত। কিন্তু তাতে লাভ হতো না। পরী যে কলেজে পড়ত, হাসানও সেই কলেজে পড়ত। কাজেই তাদের দেখা সাক্ষাৎ হতো। এজন্য নিরু মেম্বার খুব ভয়ে ছিল এবং হাসানকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এটা সত্য নিরু মেম্বার নিজে হত্যা করেনি। সম্ভবত লাঠিয়াল জয়নাল কাজটা করেছে। জয়নালের শরীরে অনেক শক্তি। জয়নাল আর হাসানের ঘরের মধ্যে একটা দরজা আছে। সেই দরজাটা জয়নালের ঘরের ভিতর থেকে বন্ধ থাকত। আমার ধারণা রাতে জয়নাল দরজা খুলে হাসানের ঘরে

ঢুকে ঘুমের মধ্যে হাসানকে হত্যা করে। তারপর বাড়ির একেবারে পিছনে বাগানের মধ্যে যেখানে মানুষজন কেউ যায় না সেখানে গর্ত করে মাটিচাপা দেয়। পাশে আর একটা গর্ত করে হাসানের বই খাতা, জামা কাপড় পুতে রাখে। নিরু মেম্বার জানত হাসান এতিম এবং হাসান মারা গেলে কেউ খোঁজ খবর করতে আসবে না। ফলে হত্যাকান্ডের কথা কেউ জানতে পারবে না। সত্যি তাই হতে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সফল হতে পারল না। পরীর অসুস্থতার কারণে তার অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় সে এখন পুলিশের কাছে গ্রেফতার হয়েছে।

হাসান খানিকটা অস্থির হয়ে বলল, কিন্তু স্যার, পরী অসুস্থ হলো কেন? পরীর অসুখটা কী?

নিরু মেম্বার এবং জয়নাল যখন হাসানকে মেরে দরজা দিয়ে বের করে তখন পরী সবকিছু দেখেছিল। সম্ভবত ঐ সময় কোনো কারণে পরীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করতে পার আমি সবকিছু জানলাম কীভাবে। পরী তার কয়েকটা খাতায় তার অবচেতন মনে কিছু কথা লিখেছে। লিখেছে, 'তুমি আর জয়নাল ওকে হত্যা করলে। ভেবেছে কেউ দেখবে না। আমি দেখেছি। আমি তোমাদের ছাড়ব না, আমি নিজে পুলিশকে সব বলে দেব।' খাতাগুলো আমি ইমাম সাহেবের কাছে রেখে এসেছি। পুলিশকে দেবে। সম্ভবত ঐ রাতে পরী বাগানের মধ্যে দিয়ে চালতা গাছ পর্যন্ত গিয়েছিল, কিন্তু বিষয়টা সে খাতায় লিখেনি। এজন্য আমি খুব সন্দিহান ছিলাম, লাশটা কোথায়? ধারণা করেছিলাম বাড়ির পুকুরে ফেলবে। পানির মধ্যে ফেললে লাশ আর কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু নিরু মেম্বার বাড়ির পুকুরে লাশ ফেলার মতো ঝুকি নিবে না বলে আমার ধারণা ছিল। কারণ লাশ পানিতে ভেসে উঠতে পারে। এজন্য অনুমান করছিলাম লাশটা অন্য কোথাও মাটিচাপা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া হাসান যে ঘরে থাকত সেই ঘরে বই, খাতা, জামা-কাপড় কিছুই ছিল না। একজন মানুষ বাড়ি থেকে সবার অগোচরে চলে গেলে সবকিছু নেবে না। কিছু না কিছু রেখে যাবে। পুরাতন স্যান্ডেল, কাপড় বা খাতা এগুলো থাকার কথা, কিন্তু ছিল না। এমনকি বিছানার নিচে যে পুরাতন কাগজপত্র থাকে তাও ছিল না। হাসানকে যে হত্যা করা হয়েছিল এটা আমার সন্দেহ করার বড় একটা কারণ ছিল। যাইহোক, পুকুরে বইখাতা, পুরাতন কাপড় চোপড় যে ফেলা যাবে না সেটা নিরু মেম্বার ভালোই বুঝতে পেরেছিল। এজন্য বাগানের পিছনে চালতা গাছতলা বেঁছে নিয়েছিল সে। বুদ্ধিটা সে ভালোই করেছিল, সবই করেছিল পরীর মঙ্গলের জন্য, কিন্তু দুর্ভাগ্য তার অপকর্ম পরী দেখে ফেলে। এতিম খানার শিক্ষক আবুল কাশেমের সাথে দেড় মাস কথা না বলা, কলেজে না যাওয়া এবং ঘরের মধ্যে পুরাতন বাই খাতা, কাপড়-চোপড়, কাগজ-পত্র না থাকার কারণে আমি যখন নিশ্চিত হই হাসানকে হত্যা করা হয়েছে তখন আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন ছিল হাসানের লাশ কোথায় গুম করা হয়েছে তা বের করা। গতকাল রাত থেকে এই চিন্তাটা আমাকে অস্থির করে রেখেছিল। পরে রাতে তোমার ফোনে যখন জানতে পারলাম, পরী চালতা গাছের নিচে কিছু খুঁজছে তখন অনুমান করলাম লাশটা চালতা গাছের নিচে গুম করা হয়েছে। আজ সকালে তার প্রমাণও পেলাম। আসলে মানুষের অবচেতন মন (subconscious mind) যখন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন অনেক সুপ্ত বা গোপন তথ্য বা ইচ্ছে ব্যক্তির অজান্তেই প্রকাশ হয়ে যায়। পরীর চালতা গাছের নিচে হেঁটে বেড়ানোর ঘটনাটা তার অবচেতন মনের ইচ্ছে ছিল যা আমাদের হাসানের লাশ উদ্ধার করতে সাহায্য করেছে।

ডাক্তার তরফদার টেবিলের উপর রাখা গ্লাস থেকে পানি খেলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, তুমি জানতে চেয়েছ পরী কেন অসুস্থ হলো। ব্যাপারটা বলছি তোমাকে। সত্যি কথা বলতে কী তুমি যে পরীকে বিয়ে করেছ সে আসল পরী না। সে হচ্ছে 'মন ভাঙ্গা পরী'। তুমি

জানো আমাদের সবারই একটা মন আছে। ভালো সংবাদে আমাদের মন যেমন আনন্দিত হয়, খারাপ সংবাদে ব্যথিত হয়। ক্রমাগত খারাপ সংবাদ আর চাপে মনটা একসময় ব্যথিত হতে হতে ভেঙ্গে পড়ে। পরীর মনটাও এরূপ ক্রমাগত চাপে ভেঙ্গে গেছে। প্রথম চাপটা সৃষ্টি হয় তার কলেজে যাওয়া নিয়ন্ত্রিত হওয়ায়। দ্বিতীয় চাপ সৃষ্টি হয় ক্রমাগত বিয়ের চাপ আসা থেকে। তৃতীয় চাপের সৃষ্টি হয় বখাটে ছেলেদের উৎপাতে। চতুর্থ চাপের উৎপত্তি নিজের বাড়ির মধ্যে বন্দী হওয়ার মতো অবস্থা থেকে। এত চাপ সহ্য করার মতো ক্ষমতা পরীরের মনে ছিল না। কারণ পরীর বয়স তখন মাত্র সতের কিংবা কিছু বেশি। তাই সে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল দমবন্ধ হয়ে আসা এই চাপের মধ্যে থেকে বের হয়ে আসার জন্য। কিন্তু কে তাকে বের করবে? প্রিয় বাবা যাকে সে সবচেয়ে ভালোবাসে তার সিদ্ধান্তগুলোই তার মধ্যে চাপের সৃষ্টি করেছে। তার মা তার বাবাকে ক্রমাগত সমর্থন দিয়ে গেছে। অবশ্য হাসানকে হত্যার ব্যাপারটা তার মা জানত না। যাইহোক, মানসিক চাপ থেকে বের হয়ে আসার জন্য সে যে ছোট বোন জরির সাহায্য নিবে সেই উপায়ও ছিল না। কারণ জরি অপরিণত, তাছাড়া বয়সের পার্থক্যও বেশি। ঐ সময় হঠাৎই বাড়িতে পেয়ে যায় হাসানকে। নিজের মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে হাসানের মধ্যে সে নতুনভাবে নিজেকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। কারণ তার জীবনে তখন নতুনত্বের প্রয়োজন ছিল। একঘেয়েমি বিরক্তিকর জীবনে সে সত্যি হাঁপিয়ে উঠেছিল। বয়ঃসন্ধীকালে একজন ছেলে আর একজন মেয়ের নতুনত্বের সবচেয়ে প্রলুব্ধ অধ্যায় হলো প্রেম, ভালোবাসা। চিরাচরিত প্রাকৃতিক নিয়মেই তারা একে অন্যের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। হাসানের দারিদ্র আর পায়ের অক্ষমতা পরীকে হাসানের প্রতি আরও দুর্বল করে তোলে। কারণ স্বাভাবিকভাবে আমরা সবসময় গরীব আর অক্ষম মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকি। পরীর সহানুভূতিশীলতা তাদের পারস্পকি দুর্বলতাকে আরও শক্ত বাঁধনে আবদ্ধ করে। তাই প্রেমের প্রথম পর্যায়ে প্রেমের প্রকাশ ঘটাতে যা যা হয় তাই তাদের মধ্যে হয়েছে। নিজেদের মধ্যে গোপনে কথা বলা, লুকিয়ে হাসানের জন্য খাবার পৌঁছে দেয়া, পরীকে হাসানের ছোট খাট উপহার দেয়া, নিজেদের মধ্যে চিঠিপত্র আদান প্রদান করা এইসব আর কি! তবে তারা দুজনেই তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব আশঙ্কিত ছিল। এই আশঙ্কাটা পরীর মনের চাপ ধীরে ধীরে আরও বাড়াতে থাকে। এর মধ্যে নিরু মেম্বার সবকিছু জেনে গিয়ে তাদের বিচ্ছেদের চেষ্টা করলে পরী মানসিকভাবে সত্যি দুর্বল হয়ে পড়ে। এখানে আর একটা বিষয় উল্লেখ করতে হবে। হাসান পরীদের বাড়িতে শিক্ষক হিসেবে থাকলেও সে কখনও শিক্ষকের মর্যাদা পেত না। পরিবারে তার অবস্থান ছিল অনেকটা কাজের মানুষের মতো। এজন্য তাকে জয়নালের পাশের কামরায় থাকতে দেয়া হয়েছিল। তাকে দিয়ে বাজার করানোর পাশাপাশি অন্য নানারকম কেনাকাটার কাজ করানো হতো। সম্ভবত পরী এই ব্যাপারগুলো মেনে নিতে পারত না। পারত না বলেই সে সবসময় মানসিক যন্ত্রণায় ভুগত। এই যন্ত্রণা তাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে সে মুক্তির জন্য পাগল হয়ে উঠে। মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল হাসানকে বিয়ে করা। কিন্তু তখন পরিস্থিতি এমন ছিল যে হাসানকে বিয়ে তো দূরের কথা, হাসানকে নিয়ে চিন্তা করাও তার জন্য ছিল পাপ। এরকম চরম অবস্থায় যখন নিরু মেম্বার আর জয়নাল মিলে হাসানকে হত্যা করল তখন পরী তার মনের উপর আর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারল না। তার মনটা ভেঙ্গে দুটুকরো হয়ে গেল। এখানে দুটো বড় ধরণের আঘাত পেয়েছিল পরী। প্রথম আঘাতটা এসেছিল হাসানের মৃত্যুর কারণে। আর দ্বিতীয় আঘাতটা পেয়েছিল তার বাবার খুনী হিসেবে আত্মপ্রকাশের কারণে। পরী তার বাবাকে ছোট বেলা থেকে এতটাই ভালোবেসেছে যে সে কল্পনাও করতে পারেনি তার বাবা

খুন করতে পারে, তাও হাসানের মতো একটা অসহায় ছেলেকে। এই দুটো আঘাতের কারণে পরী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পরীর মধ্যে জমা হয় পুঞ্জিভূত ক্ষোভ, ঘৃণা; তার মনে জন্ম নেয় প্রতিহিংসার স্পৃহা। পরী তখন চিন্তা করতে থাকে কীভাবে তার বাবার ঐ ভয়ংকর কুকর্মের কথা সবাইকে জানিয়ে দিবে। কিন্তু সে সাহস পাচ্ছিল না। তার দ্বিধাবিভক্ত মন একবার তার বাবার বিরুদ্ধে যায়, এরপর আবার তার বাবার পক্ষে যায়। কারণ শত হলেও বাবা তো। বাবার বিরুদ্ধে যাওয়া এত সহজ ব্যাপার না। ব্যাপারটা তার জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন। না পারছিল সে সহ্য করতে, না পারছিল প্রকাশ করতে। মানুষের মধ্যে যখন অসহ্য, অসহনীয় কোনোকিছু থাকে তখন মানুষ নানাভাবে সেটা বের করে দিতে চেষ্টা করে, প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। সাধারণত মানুষের প্রকাশ দুই রকমের। একটা মৌখিক আর একটা লিখিত। পরী যেহেতু মুখে বলার মতো কাউকে পাচ্ছিল না, এ কারণে সে অবচেতন মনে খাতার মধ্যে লিখতে থাকে। হয়তো সে চাচ্ছিল তার এই লেখা পড়ে কেউ তার বাবার কুকর্মের কথা জানুক। পরীর মানসিক অস্থিরতার এটা ছিল প্রথম দিকের প্রকট লক্ষণ। যাইহোক, খাতার লেখা পড়ার মতো তখন আশেপাশে কেউ ছিল না। সে না যেতে পারছিল কলেজে, না আসছিল তাদের বাড়িতে নতুন কেউ। ফলে তার মনের ক্ষোভ ধীরে ধীরে প্রশমিত ওয়ার পরিবর্তে বাড়তেই থাকে।

এদিকে হাসানের প্রতি নিজের দুর্বলতাকে পরী কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। যেহেতু সামাজিক অবস্থানগত দিক দিয়ে পরী ছিল উচু স্তরের, সম্ভবত ভালোলাগার প্রস্তাবটা পরীর কাছ থেকেই গিয়েছিল। এজন্য হাসানের মৃত্যুতে সে চরম হীনমন্যতা আর অপরাধবোধে ভুগতে থাকে। তাই রাতের অন্ধকারে তার অবচেতন মন (subconscious mind) তাকে নিয়ে যায় চালতা তলায় হাসানের কবরের পাশে। এটা চরম মনসিক ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ। মানুষের অবচেতন মান যখন সচেতন মনকে (conscious mind) ছাপিয়ে উঠে মানুষ তখন নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এদিকে পরীর চালতা তলায় যাওয়ার ব্যাপারটা প্রথম টের পায় তার মা। সে পরীর বাবা নিরু মেম্বারকে বললে নিরু মেম্বার সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যায়। কারণ নিরু মেম্বার তখন বুঝতে পারে কোনো না কোনোভাবে পরী জেনে গেছে যে হাসানকে সে হত্যা করেছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব সে চেষ্টা করে পরীকে ঐ বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে নতুন এক দায়িত্বশীল জীবনে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার। আর এর একমাত্র উপায় ছিল পরীকে বিয়ে দেয়ার। এজন্য পরীকে তাড়াহুড়া করে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। আর ঐ দিনই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে না গেলে পথের মধ্যে পরীকে জ্বীনে ধরতে পারে। কারণ নিরু মেম্বার পরীর অসুস্থতা নিয়ে শঙ্কিত ছিল।

তোমার সাথে পরীর বিয়েটা পরীর জন্য এতটাই ভয়ংকর ছিল যে পরীর ভাঙ্গা মনটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তার মনের মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভ, কষ্ট, যন্ত্রণা তখন বিস্ফোরিত হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু পরী সজ্ঞানে তা করতে পারছিল না। কারণ সজ্ঞানে তখনও সে তার বাবাকে ভালোবাসে। আর কিছুতেই সে তোমার মতো নীরিহ একজন মানুষকে অপমান করতে চাচ্ছিল না, বিব্রত করতে চাচ্ছিল না। কিন্তু সে ভয়ানক মানসিক চাপ আর কষ্টটাও সহ্য করতে পারছিল না। অথচ এগুলো থেকে সে পরিত্রাণ চাচ্ছিল। যেহেতু মানসিক সমর্থন না থাকায় সে মুখ দিয়ে কিছু বলতে পারছিল না তখন সে শরীর দিয়ে সেটা বলতে শুরু করে। প্রথমে ঠোঁট কাঁপতে থাকে, তারপর চোখ, তারপর হাত এবং পা। এসকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঐ সময় এমন ভয়ংকরভাবে কাঁপতে থাকে যে দেখলে ভয় লাগে। এটা একটা সাইকোসোমাটিক (psychosomatic

disorder) বা শরীরবৃত্তীয় মানসিক সমস্যা। এক্ষেত্রে প্রকাশটা মুখ দিয়ে না হয়ে শরীর দিয়ে ঘটে। লক্ষণের উপর নির্ভর করে বোঝা যায় অসুখটা কি ধরণের। পরীর যেটা হয়েছে সেটা হলো হিস্টেরিয়া (hysteria). যখন পরী অসুস্থ হয়ে পড়ে লক্ষ্য করবে, পরী মুখ দিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু না পারার কারণে তার শরীর কাঁপতে থাকে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত (non-voluntery). এতে পরী কিংবা রুগীর কোনো হাত থাকে না। ইচ্ছে করলেই সে শরীর ওভাবে কাঁপাতে পারবে না। আবার ইচ্ছে করলেও থামাতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না শরীরের অভ্যন্তরের রাগ, ক্ষোভ, কষ্ট এভাবে কম্পনের (convulsion) মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে শরীর থেকে বের না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রুগী শান্ত হবে না। আমরা এন্টি-ডিপ্রেসেন্ট (anti-depressant) ওষুধ ব্যবহার করে এ ধরনের কম্পন থামিয়ে রাখতে পারি ঠিকই, কিন্তু সেটা সাময়িক, স্থায়ী কোনো সমাধান না। মূল সমাধান হলো কারণ খুঁজে বের করে সেটা দূর করা। তাহলেই রুগী সুস্থ হবে। পরীর ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটা ছিল তার বাবার বিচার হওয়া। বিচারটা হচ্ছিল না দেখে চরম মনঃকষ্ট থেকে সে গতকাল থানায় চলে গিয়েছিল। অথচ পুলিশের সামনে গিয়ে সে কিছু বলতে পারেনি। কারণ ঐ একটাই, সে তার বাবার বিরুদ্ধে বলতে পারছিল না। সেখানে মনের মধ্যে 'বলা না বলার' চরম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে একপর্যায়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। যদি অপরাধী তার বাবা না হয়ে অন্য কেউ হতো তাহলে হয়তো সে অসুস্থ হতো না, সহজেই সবকিছু বলতে পারত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পারেনি। এরকম অসুস্থতায় প্রচুর শক্তি ব্যয় হয় বিধায় রুগী খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। শারীরিক শক্তি ফিরে পেতে তখন আবার সময় লাগে। যখন সে সুস্থ হয়ে উঠে আবার ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে ক্ষোভ, যন্ত্রণা এবং কষ্ট জমা হতে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পর একইভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার মাধ্যমে সেগুলো প্রশমিত হয়। এভাবেই চলতে থাকে। এই হিস্টিরিয়া কিন্তু সাধারণ কোনো অসুখ নয়। ভয়ংকর অসুখ। যথাযথ চিকিৎসা না হলে রুগীকে ভয়ংকর পরিণতি বরণ করতে হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো গ্রামে গঞ্জে কারো মধ্যে এ ধরনের লক্ষণ দেখা গেলে বলা হয় তাকে ভূত-প্রেত কিংবা জ্বীনে ধরেছে। তখন এই ভূত-প্রেত আর জ্বীন ছাড়ানোর কথা বলে রুগীর উপর ভয়ানক অত্যাচার করা হয়। এতে রুগী আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরীও ছিল এরকম এক ভিকটিম। ভাগ্যভালো যে তুমি পরীকে ঢাকায় নিয়ে এসেছ এবং পরীর অসুস্থতার কারণটা বের করা গেছে। এরূপ অসুস্থতার সময় রুগীর শরীর বিশ্রীভাবে বেঁকে যাওয়ার কারণে যে কোনো সময় নার্ভ ছিড়ে যেতে পারে। এতে রুগীর শরীর বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্যারালাইসড্ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এমন কি রুগী অন্ধও হয়ে যেতে পারে। পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে রুগী অন্যকে আঘাত করতে পারে, আহত করতে পারে। ঐ অবস্থায় যথাযথ চিকিৎসা না হলে রুগীকে বাঁচান দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এজন্য মানসিক রুগীর চিকিৎসা ধীরে ধীরে ধৈর্যের সাথে দীর্ঘসময় নিয়ে করতে হয়। একবার সুস্থ হয়ে উঠলে আবার যদি কোনো কারণে মানসিক আঘাত পায় তাহলে চরম মানসিক ক্ষতের (acute mental trauma) সৃষ্টির মাধ্যমে অসুখটার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। একারণে আজীবন মানসিক রুগীর উপর বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। পরীর প্রতিও তোমার বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। পরীর মনের মধ্যে যে যন্ত্রণা ছিল তা প্রশমিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় আশা করছি পরী সুস্থ হয়ে উঠবে। এখন কিছুদিন পরীকে তুমি পরীর মতো থাকতে দেবে। ওরা ভাঙ্গা মন জোড়া লাগানোর জন্য কিছু সময় লাগবে। তারপর পরীর মনটাকে নিজের মতো করে গড়ে নেবে। তাহলেই তোমরা সুখী হতে পারবে। তবে মনে রাখবে, পুরাতন স্মৃতির পুনরাবৃত্তি আবার অসুখটাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। পুরাতন স্মৃতি

নিয়ে নিজে থেকে কোনো আলোচনা করবে না, পরীকে কখনও খোটা দেবে না। সেক্ষেত্রে সবকিছুর পরিণতি খুব ভয়ানক হবে। আমি অবশ্য পুলিশকে বলে দেব তারা যেন নিরু মেম্বারের কেসে পরীকে সাক্ষী না করে। এতে পরীকে তার অসহ্য স্মৃতি পূনরায় মনে করতে হবে না এবং মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে সে মুক্ত থাকবে।

ডাক্তার তরফদারের কথাগুলো ইমরান অবাক হয়ে শুনছিল। সে বিড় বিড় করে বলল, এখন কী করব স্যার? পরী তো কাঁদছে।

পরীকে কাঁদতে দাও। পরীর মনের মধ্যে যে যন্ত্রণা, কষ্ট আর ক্ষোভ ছিল সব এখন শারীরিক কম্পন হিসেবে বের না হয়ে চোখের পানি হিসেবে বের হচ্ছে। এটা ভালো, খুবই ভালো। আসলে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, ক্ষোভ এগুলো আমাদের শরীরকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনা শরীরে অতিরিক্ত তাপের সৃষ্টি করে। এই তাপ চোখের পানি দিয়ে বের হয়ে যায়। এজন্য চোখের পানি গরম থাকে। আমি কথাগুলো খুব সহজভাবে বললাম যেন তুমি বুঝতে পার। বৈজ্ঞানীক ব্যাখ্যার দিকে আর গেলাম না। তাহলে সবকিছু অনেক জটিল মনে হবে।

স্যার সবকিছুই তো বললেন, কিন্তু একটা ব্যাপারে কিছু বললেন না। পরীকে বিয়ে করার পর থেকে আবার বিপদগুলো কেমন যেন কেটে যাচ্ছে। আপনি শুনে অবাক হবেন যে গতকাল আমি যে বেতন পেয়েছিলাম সব আমি খরচ করে ফেলেছিলাম। খুব চিন্তায় ছিলাম সামনের দিনগুলো কীভাবে কাটাব সেটা ভেবে। অথচ আজ কী অদ্ভুত একটা কান্ডই না ঘটল। ব্যাংকে যাওয়ার পর শুনি গত বছর ব্যাংক খুব ভালো লাভ করায় সবাইকে দুই মাসের বেসিকের সমান মধ্যবর্তী বোনাস দেয়া হয়েছে এবং টাকা আজই তোলা যাবে। আমি আজই টাকা তুলেছি এবং এখন আমার কাছে অনেক টাকা। মজার ব্যাপার হলো গত বছরে আমি ব্যাংকের চাকরিতে ছিলাম না। তারপরও বোনাস পেয়েছি। এর ব্যাখা কি?

এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। তুমি হয়তো এই ঘটনার মধ্যে অলৌকিক কিছু খুঁজছ। আসলে কিন্তু তা নয়। প্রথম ঘটনায় আসি। তুমি বলেছিলে বাসের মধ্যে পুলিশ দেখে পরী তোমাকে পরের বাসে উঠতে বলেছে এবং প্রথম বাসটি অ্যাকসিডেন্ট করেছে। এই ঘটনায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ পরীর মনের মধ্যে একটা ইচ্ছে ছিল সে পুলিশকে হাসান হত্যার বিষয়টি খুলে বলবে। কিন্তু ঐ মুহূর্তে বলার মতো পরিস্থিতি ছিল না। কারণ বাসে অনেক মানুষ ছিল। কিন্তু তার বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল। তাই মানসিক সংঘাত এড়াতে সে বাস থেকে নেমে যায়। কারণ তখন তার নিজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিল। আর বাস অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারটি নিতান্তই দুর্ঘটনা। এরপর দোকান থেকে বাকি পাওয়ার ঘটনায় আসি। তুমি এই বাসায় আছ অনেকদিন। একই দোকান থেকে মুদি জিনিসপত্র কিনছ এবং নিয়মিত টাকা দিচ্ছ। কাজেই দোকানদারের তোমার উপর একরকম বিশ্বাস জন্মেছে। এজন্য তোমাকে সামান্য কিছু মুদি জিনিসপত্র বাকী দিতে সে দ্বিতীয় চিন্তা করেনি। এরপর তুমি বলেছ আমার বাসায় থাকতে পাওয়ার বিষয়টা অলৌকিক। গত কয়েকদিনে আমার সাথে মিশে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ আমি মানুষ হিসেবে একেবারে খারাপ না। অন্তত নতুন কেউ বিয়ে করে এসে আমার বাসায় উঠবে আর তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব, এতটা নিষ্ঠুর আমি নই। আর আজকে তোমার বোনাস পাওয়ার বিষয়টাও ব্যাংকিক সেক্টরে একটা স্বাভাবিক ঘটনা। প্রত্যেক ব্যাংকই তাদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বছরে কয়েকটি অতিরিক্ত বোনাস দেয়। এবার অতিরিক্ত বোনাস দেয়ার পাশপাশি নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তা কর্মচারীদেরও অর্ন্তভুক্ত করেছে। এটা ব্যাংকের পলিসির বিষয়। এখানে তোমার গতবছর চাকরি

করা না করার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। কাকতালীয়ভাবে হয়তো তোমার অভাবের সময় তুমি টাকাটা পেয়ে গিয়েছি। এরপরও তুমি যদি মনে করো বিষয়টা অলৌকিক, তাহলে মনে করবে সবচেয়ে বড় বিপদের মধ্যে দিয়ে তুমি কিন্তু সময় পার করছ। আর তা হলো পরীর অসুস্থতা। এই বিষয়টাকে ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না।

হাসান উৎসুক হয়ে বলল, স্যার আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে?

কী?

পরী অসুস্থ দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তিন দিন আমি ওর সাথে থাকব। তাই আজ ছুটির দরখাস্ত করেছিলাম। কিন্তু ম্যানেজার আমাকে তিন দিনের পরিবর্তে সাত দিন ছুটি দিয়েছে। এটাকেও কি আপনি সাধারণ বলে ব্যাখ্যা করবেন?

ডাক্তার তরফদার মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, তোমার কি মনে হয়?

আসলে আমার ম্যানেজার খুব বদরাগী। যেহেতু তিনি আমাকে তিন দিনের স্থানে সাতদিন ছুটি দিয়েছেন আমি বিশ্বাস করছি এটা পরীর জন্যই ঘটেছে।

ডাক্তার তরফদার হাসিটা বিস্তৃত করে বললেন, ইমরান, আসলে তুমি খুব ভালো একজন মানুষ, শুধু ভালো না, অসাধারণ ভালো। এজন্য ডাক্তার তরফদারের মতো কাঠখোট্টা মানুষ তোমাকে তার বাসা থেকে বাসর রাতে বের করে দেয়নি, পাড়ার মুদী দোকানদার তোমাকে বাকীতে জিনিস দেবে না বলে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি, ব্যাংকের ম্যানেজার তোমাকে ছুটি দেবে না বলে উচ্চবাচ্য করেনি। মনে রেখো ভালো মানুষেরা কখনও ঠেকে থাকে না। কেউ নজর না রাখলেও মহান আল্লাহতালা ভালো মানুষকে সাহায্য করেন। যেমন তোমাকে করেছে। আমার বিশ্বাস তোমার মন ভাঙ্গা পরীর মনও জোড়া লাগতে শুরু করেছে। আর মাত্র কয়েকদিন। তখন দেখবে তুমি হবে অন্যতম সুখী মানুষ।

১৮

তিন দিন পর।

মাঝরাতের আগে ইমরান ছাদে বসে আকাশের তারা গুনছে। তার মনটা খারাপ। কারণ গত তিন দিন ধরে পরীও মন খারাপ করে আছে। ডাক্তার তরফদারের কথা সত্য হয়নি। পরীর ভাঙ্গা মন জোড়া লাগেনি। পরী স্বাভাবিক হয়নি। পরীর আগের অসুস্থতার লক্ষণগুলো দেখা না গেলও আজ সকাল থেকে নতুন উপসর্গ শুরু হয়েছে। পরী শব্দ করে কাঁদছে। মানুষ একদিনে কতটা কাঁদতে পারে, আজ পরীকে না দেখলে বোঝা যেত না। এজন্য মনটা খুবই খারাপ ইমরানের।

ইমরান মুখ উচু করে বার বার তারা গোনার চেষ্টা করছে। আসলে তারা গোনা একটা অজুহাত। সে মূলত পরীকে ভুলত চেষ্টা করছে, না পরীকে না, পরীর কষ্ট পাওয়াকে ভুলতে চেষ্টা করছে। পরীকে সে কোনোদিনও ভুলতে পারবে না। কারণ দিন যতই যাচ্ছে তার মনে হচ্ছে পরীর জন্য ভালোবাসা তার ততই বাড়ছে। পরী তার কাছে অনন্য, অপূর্ব।

কী করছ?

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল ইমরান। পিছনে ফিরে দেখে পরী ছাদে উঠে এসেছে। আজ এই প্রথম পরী ছাদে এলো। পরীকে দেখে বিস্ময়ে থমকে গেছে ইমরান। এ কোন পরীকে দেখেছে সে? পরী তার দেয়া লাল শাড়ীটা পরে এসেছে। লাল একটা টিপও পরেছে। কী সুন্দর লাগছে দেখতে! একেবারে যেন টুকটুকে লাল একটা পরী।

পরী মৃদু হেসে বলল, কী দেখছ?

ইমরান কোনো কথা বলতে পারল না। তার চোখ দুটো শুধু বড়ই হলো।

পরী বলল, চলো ঘুমাবে। এত রাতে আকাশে তারা দেখার দরকার নেই। আগামীকাল পূর্ণিমা। আগামীকাল তুমি আমার হাত ধরে আমাকে ছাদে নিয়ে আসবে। তারপর দুজনে একসাথে পূর্ণিমা দেখব। ঠিক আছে?

ইমরান সম্মতিসূচক মথা দুলালে পরী রহস্যময় একটা হাসি দিল। তারপর ইমরানের হাত ধরে নিচে নামার জন্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, তুমি কিন্তু অনেক আগে করা আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাওনি?

ইমরান ঠিক মনে করতে পারল না পরী তাকে কোন প্রশ্ন করেছিল এবং সে উত্তর দেয়নি।

পরী এবার মাথা তুলে ইমরানের চোখে তাকাল। তারপর রহস্যময় হাসিটা আরও বিস্তৃত করে বলল, তুমি কিন্তু আমাকে বলোনি আমি তোমাকে কী বলে ডাকব। আজ রাতে অবশ্যই বলবে। তা না হলে তোমাকে ঘুমাতে দেব না।

ইমরানের মাথাটা ভো ভো করে ঘুরতে লাগল। তাই তো, পরী তাকে কী বলে ডাকবে? এখনও বের করতে পারেনি সে। অথচ প্রশ্নের উত্তরটা খুব জরুরী।

এই মুহূর্তে মিষ্টি এই প্রশ্নের উত্তরটা ইমরানের কাছে সবচেয়ে কঠিন মনে হচ্ছে। সে বুঝতে পারছে এই প্রশ্নের উত্তর সে কোনোদিনও খুঁজে পাবে না। আর এ কারণে পরীও কোনো রাতে তাকে আর ঘুমাতে দিবে না। প্রশ্নের উত্তর খুঁজে খুঁজে তাকে শুধু বিরক্ত করবে। তবে ঐ প্রশ্নে সে কোনোদিন বিরক্ত হবে না। কারণ পরীর কাছ থেকে ঐ প্রশ্নটা শোনার জন্যইতো সে এতদিন অপেক্ষা করে আছে!

রচনাকালঃ (ঢাকা ০৭/০৩/১৩- ১৫/০৩/২০১৩ এলফেসার, দার্ফুর, সুদান)

মোশতাক আহমেদ

জন্ম ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৫, জেলা ফরিদপুর। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট থেকে এম ফার্ম ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এমবিএ এবং ইংল্যান্ডের লেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে ক্রিমিনলজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি একজন চাকরিজীবী। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক।
তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে ,

সায়েন্স ফিকশন : *গামা, অমর মানব, প্রজেক্ট ইক্টোপাস, লালমানব, রোবটিজম, লাল শৈবাল, নিলির ভালোবাসা, নিঃসঙ্গ জিরি, দ্বিতীয় পৃথিবী, গিটো, প্রজেক্ট হাইপার, নিকি, নিরি, রিরি, লাল গ্রহের লাল প্রাণী, বায়োবোট নিওক্স, গিপিলিয়া, গিগো, ক্রিকি, সবুজ মানব, অণুমানব, রোবটের পৃথিবী, নিহির ভালোবাসা, ক্রি, রোবো, পাইথিন, ক্লিটি ভাইরাস, লিলিপুটের গ্রহে ।*
সায়েন্স ফিকশন রিবিট সিরিজ : *রিবিট, রিবিট ও কালো মানুষ, রিবিট এবং ওরা, রিবিটের দুঃখ, শান্তিতে রিবিট, রিবিটের জীবন, হিমালয়ে রিবিট, রিবিট ও এলিয়েন নিনিটি, রিবিট ও দুলাল, এক ব্যাগ রিবিট।*
প্যারাসাইকোলজি : *স্বপ্নস্বর্গ, ছায়াস্বর্গ, মন ভাঙা পরি, নীল জোছনার জীবন, বৃষ্টি ভেজা জোছনা, জোছনা রাতের জোনাকি, মায়াবী জোছনার বসন্তে।*
শিশিলিন কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ : *ডাইনোসরের ডিম, লাল গ্যাং, জমিদারের গুপ্তধন, হারানো মুকুট, কালু ডাকাত, কঙ্কাল ঘর, লালু চোর, ডলার গ্যাং, খুলি বাবা, কানাদস্যু।*
সামাজিক ও মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস : *নক্ষত্রের রাজারবাগ, জকি, লাল ডায়েরি, শিকার।*
ভ্রমণ উপন্যাস ঃ *বসন্ত বর্ষার দিগন্ত*
কিশোর উপন্যাস : *ববির ভ্রমণ, মুক্তিযোদ্ধা রতন ।*
ভৌতিক উপন্যাস : *রক্তনেশা, রক্তসাধনা, প্রতিশোধের আত্মা, ইলু পিশাচ, অশুভ আত্মা, আত্মা, কালা পিশাচ, অভিশপ্ত আত্মা, উলু পিশাচের আত্মা, শয়তান সাধক চিলিকের আত্মা, রক্ত পিপাসা, রক্তৃতৃষ্ণা, প্রেতাত্মা, অতৃপ্ত আত্মা।*
লো অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ : *লো, নরেন্দ্র জমিদারের যুগে, জংলীর দেশে, রাক্ষসের দ্বীপে, দূর গ্রহের নিগি, রোবটের যুগে।*
পুরস্কার : বাংলা একাডেমি সাহিত্য পদক ২০১৮, শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৮, কালি ও কলম সাহিত্য পুরস্কার ২০১২, চ্যানেল আই সিটি আনন্দ আলো সাহিত্য পুরস্কার-২০১৫, ছোটোদের মেলা সাহিত্য পুরস্কার-২০১৪।

www.facebook.com/mostaque.ahamed.5

বইয়ের প্রাপ্তি ঃ booklightbd.com (Cell – 01787748888),
www.rokomari.com